দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

এ রাজ্যে করোনার সব তথ্য লুকোনো শাড়ির আঁচলে
— পৃঃ ৮

মৌলবাদী ধর্মীয় সংকীর্ণতা এবং বিদ্বেষ করোনা ভাইরাস থেকেও ভয়ানক
— পৃঃ ১২

৭২ বর্ষ, ৩১ সংখ্যা।। ২৭ এপ্রিল, ২০২০।। ১৪ বৈশাখ - ১৪২৭।। যুগাব্দ ৫১২২।। website : www.eswastika.com

কী লুকোচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী ?

Amul's INDIA 3.0

BASED ON 50 YEARS OF AMUL ADVERTISING
BY daCUNHA COMMUNICATIONS

Amitabh Bachchan • Agnello Dias • Anuvab Pal • Arnab Goswami
Ayaz Memon • Bachi Karkaria • Indrajit Hazra • Jai Arjun Singh • Jayant Rane
Jug Suraiya • Karan Johar • Kiran Khalap • M.J. Akbar • Manish Jhaveri
Nana Chudasama • Naresh Fernandes • Rahul daCunha • Sachin Tendulkar
Santosh Desai • Shashi Tharoor • Shyam Benegal • Sidharth Bhatia
Sylvester daCunha • Dr V. Kurien • Vir Sanghvi • Vishal Dadlani • V.V.S. Laxman

पतंजलि®

प्रकृति का आशीर्वाद

करोड़ों देशवासियों का भरोसेमन्द हर्बल टूथपेस्ट

दन्त कान्ति

दन्त कान्ति के लाभ

✓ लौंग, बबूल, नीम, अकरकरा, तोमर, बकुल आदि बेशकीमती जड़ी बूटियों से निर्मित दन्त कान्ति, ताकि आपके दाँतों को मिले लंबी उम्र व असरदार प्राकृतिक सुरक्षा।

✓ पायरिया, मसूड़ों की सूजन, दर्द व खून आना, सेंसिटिविटी, दुर्गन्ध एवं दाँतों के पीलेपन आदि को दूर करे।

✓ कीटाणुओं से लम्बे समय तक बचाकर दे दाँतों को प्राकृतिक सुरक्षा कवच।

पूरी दुनिया अब नैचुरल प्रोडक्ट्स को अपना रही है
आप भी पतंजलि के नैचुरल प्रोडक्ट्स अपनाइए और प्रकृति का आशीर्वाद पाइए

पढ़ेगा हर बच्चा
बनेगा स्वस्थ और सच्चा
दन्त कान्ति का पूरा प्रॉफिट एजुकेशनल चैरिटी के लिए समर्पित है

आवाहन– राष्ट्र के जागरुक व्यापारियों व ग्राहकों से हम विनम्र आवाहन करते हैं कि करोड़ों देश भक्त भारतीयों की तरह, आप भी पतंजलि के उत्पादों को अपनी दुकानों व दिलों में सर्वोच्च प्राथमिकता देकर जन–जन तक पहुँचाएं और देश की सेवा व समृद्धि में योगदान दें। जिससे महात्मा गाँधी, भगत सिंह व राम प्रसाद बिस्मिल आदि सभी महापुरुषों के स्वदेशी अपनाने के सपने को मिलकर साकार कर सकें।

पतंजलि आयुर्वेद के लगभग 500 उत्पाद है, ये शुद्ध खाद्य उत्पाद व हर्बल सौन्दर्य उत्पाद हमारे पतंजलि स्टोर्स के साथ ओपन मार्केट की दुकानों पर भी उपलब्ध है।

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭২ বর্ষ ৩১ সংখ্যা, ১৪ বৈশাখ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

২৭ এপ্রিল - ২০২০, যুগাব্দ - ৫১২২,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

বটপাতা খাওয়া হিন্দুরা সতর্ক হোন
▯ অমলেশ মিশ্র ▯ ৬

এ রাজ্যে করোনার সব তথ্য লুকোনো শাড়ির আঁচলে
▯ সুজিত রায় ▯ ৮

রাজ্য সরকারের হাজারো দোষ ঢাকতেই কি করোনা তথ্য গোপন? ▯ বিশ্বপ্রিয় দাস ▯ ১০

মৌলবাদী ধর্মীয় সংকীর্ণতা এবং বিদ্বেষ করোনা ভাইরাস থেকেও ভয়ানক ▯ রঞ্জন কুমার দে ▯ ১২

করোনা সংক্রমণ থেকে জীবন বাঁচাতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাই মহৌষধি ▯ ডা: দেবী শেঠী ▯ ১৪

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভায় গৃহীত প্রস্তাব : শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির নির্মাণ, ৩৭০ ধারা বাতিল এবং শরণার্থীদের নাগরিকত্ব প্রদান সশক্ত ভারত নির্মাণের একটি ধাপ ▯ ১৬

করোনা মহামারীতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সেবাকাজ ▯ ১৯

পালঘর ও বিজনসেতুর সন্ন্যাসী হত্যার ধরনে কী অদ্ভুত মিল!
▯ দেবতনু ভট্টাচার্য ▯ ২০

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ২১-২২

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

তথ্য গোপন করিতেছে রাজ্য

সকলের কাছেই ইহা এখন পরিষ্কার যে, এই রাজ্যে করোনা তাহার করাল গ্রাস ক্রমশ প্রসারিত করিতেছে। যতই দিন যাইতেছে, এই রাজ্যে অবস্থা ততই সংকটজনক হইয়া উঠিতেছে। রাজ্যে এই পরিস্থিতি লইয়া কেন্দ্র সরকার উদ্বিগ্ন। উদ্বিগ্ন বিশেষজ্ঞ মহলও। এই রাজ্যের বেসরকারি ও সরকারি হাসপাতালগুলি একের পর এক সংক্রমণের কারণে বিভিন্ন বিভাগ বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইতেছে। চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মীদের মধ্যে সংক্রমণ বাড়িতেছে। রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো যে ভাঙিয়া পড়িবার মুখে তাহাও ক্রমশ বুঝা যাইতেছে। প্রত্যহ সংক্রামিত ব্যক্তির সংখ্যাও বাড়িতেছে। এই অবস্থায় স্বাভাবিক কারণে উদ্বিগ্ন হইয়াছেন এই রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান মাননীয় রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। তিনি কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। প্রশ্নগুলি যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত এবং ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু রাজ্যপাল মহোদয় এই এই অপ্রিয় প্রশ্নগলি উত্থাপন করায় ক্ষুব্ধ হইয়াছেন রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী এবং শাসকদলের নেতৃবৃন্দ। একটু সুস্থ মস্তিষ্কে চিন্তা করিলে অবশ্য এইটুকু বুঝিতে অসুবিধা হইবে না, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁহার দলের আচরণই আজ রাজ্যের সংকট এমনতর গভীর গভীর করিয়া তুলিয়াছে।

করোনা সংক্রমণ যখন সারা বিশ্বে থাবা বসাইয়াছে এবং এই দেশেও সংক্রমণ সেই থাবা প্রসারিত করিতেছে, সেই সময়ই কেন্দ্র সরকার রাজ্যকে সতর্কবার্তা পাঠাইয়াছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সেই সতর্কবার্তায় কর্ণপাত করেন নাই। বরং মার্চ মাসের প্রথমদিকে মালদহে এক জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলিয়াছিলেন, দিল্লির শাহিনবাগ হইতে দৃষ্টি ঘুরাইতে কেন্দ্র সরকার করোনা নামক গুজব রটাইতেছে। এই নিম্নস্তরের রাজনীতি না করিয়া মুখ্যমন্ত্রী যদি কেন্দ্র সরকারের ওই সতর্কবার্তাকে গুরুত্ব দিয়া তখনই তৎপর হইতেন, তাহা হইলে হয়তো রাজ্যকে আজ এতটা সংকটের সম্মুখীন হইতে হইত না। দেশব্যাপী লকডাউন ঘোষিত হইবার পরেও মুখ্যমন্ত্রীর করোনা প্রতিরোধে আন্তরিকতার পরিবর্তে সস্তা চটুল চমকের রাজনীতি এবং আত্মপ্রচারের উদগ্র বাসনাই পরিলক্ষিত হইয়াছে। মুখ্যমন্ত্রী রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া তাঁহার স্নেহধন্য সংবাদমাধ্যমকে সঙ্গী করিয়া খড়ির গণ্ডি আঁকিয়াছেন। কিন্তু কলিকাতা এবং রাজ্যের যে সমস্ত সংখ্যালঘু অঞ্চলে লকডাউন সম্পূর্ণ অগ্রহ্য করা হইয়াছে, সেই সব অঞ্চলে লকডাউন কার্যকর করিতে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই। বরং এই সংকটের মুহূর্তেও তাঁহার সংখ্যালঘু তোষণের মানসিকতা দূর হয় নাই। বর্তমানে বিভিন্ন মহল হইতে অভিযোগ উঠিতেছে, রাজ্য সরকার করোনা সংক্রান্ত তথ্য গোপন করিতেছে। এই অভিযোগ অসার তাহা বলা যাইবে না। রাজ্য সরকারের আচরণই প্রমাণ করিতেছে কিছু গোপন করিবার প্রয়াস চলিতেছে। রাজ্য সরকার এখন বলিতেছে, করোনায় এই রাজ্যে মৃতের সংখ্যা ১৫, বেসরকারি সূত্রে জানা যাইতেছে এই সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি। এই প্রশ্নও উঠিয়াছে, চিকিৎসারত চিকিৎসকদের ক্ষমতা খর্ব করিয়া অডিট কমিটি নামক এক স্তাবকদলের হস্তে মৃত্যুর কারণ নির্ধারণ করিবার ক্ষমতা কেন অর্পণ করিল রাজ্য সরকার? কেনই বা কেন্দ্রের পর্যবেক্ষক দল এই রাজ্যে সরেজমিন অবস্থা পরিদর্শনে আসিলে রাজ্য সরকারের এত ক্ষোভ?

সমস্যাটি তথ্য গোপন করিবার নয়। বরং তথ্য গোপন করিবার ফলে এই রাজ্যে যদি বিপর্যয় আরও ভয়ংকর আকার ধারণ করে, তাহা হইলে মুখ্যমন্ত্রীকেই আসামির কাঠগড়ায় উঠিতে হইবে।

সুভাষিতম্

নরত্বং দুর্লভং লোকে বিদ্যা তত্র সুদুর্লভা।
শীলং চ দুর্লভং তত্র বিনয়স্তত্র সুদুর্লভঃ।।

পৃথিবীতে মনুষ্য জন্ম দুর্লভ। তার মধ্যে জ্ঞানবান মানুষ আরও দুর্লভ। তার মধ্যে চরিত্রবান মানুষ দুর্লভ এবং তার মধ্যেও বিনয়ী মানুষ খুবই দুর্লভ।

বটপাতা খাওয়া হিন্দুরা সতর্ক হোন

অমলেশ মিশ্র

ভারতবর্ষে হিন্দু ও হিন্দুত্ব নিয়ে যারা প্রশ্ন তোলেন, কটু হলেও বলতে বাধ্য হচ্ছি, তাঁরা একান্তই অর্বাচীন। কারণ তাঁরা হিন্দু ও হিন্দুত্বকে মুসলমান ও মুসলমানত্ব এবং খ্রিস্টান ও খ্রিস্টানত্বের মতো কয়েকটি কেবলমাত্র বিশেষ উপাসনা পদ্ধতি ও একটি বিশেষ বিশ্বাসের সঙ্গে তুলনা করেন। তাঁদের জানা দরকার যে বর্তমান পৃথিবীর প্রাচীনতম উত্তরাধিকারী হলেন হিন্দু এবং বিশ্বের প্রাচীনতম বিশ্বাস ও জীবন পদ্ধতি হলো হিন্দুত্ব। হিন্দুর উপাসনা পদ্ধতি বিচিত্র। আল্লা ও মহম্মদকে বাদ দিলে মুসলমান ও মুসলমানত্ব শূন্যে এসে যায়। একইভাবে খ্রিস্ট ও যিশুকে বাদ দিলে খ্রিস্ট ও খ্রিস্টানত্ব বিলীন হয়ে যায়। এদের বয়সও অতি অল্প। একটির প্রায় দেড় হাজার বছর, অপরটির দু'হাজার বছর। হিন্দু ও হিন্দুত্বের বয়স খুব কম করে ধরলেও পাঁচ হাজার বছর। তাই বলা যায় যে, অন্য দুটি হিন্দু ও হিন্দুত্বের হাঁটুর বয়সি। আর হিন্দুত্বে ঈশ্বরকে বাদ দিলেও হিন্দু থাকা যায়, হিন্দুত্বের হানি হয় না।

হিন্দু ও হিন্দুত্বের বিরোধিতা ও নিন্দা একটি ফ্যাশন মাত্র। না আছে গভীরতা, না আছে যুক্তিবত্তা। যে কোনো ফ্যাশনই প্রায়ই পরিবর্তিত হয় এবং এর প্রকাশ বাহ্য ব্যক্তির অন্তরের সঙ্গে ফ্যাশনের কোনো সম্পর্ক থাকে না। ফ্যাশনেরও গভীরতা ও যুক্তিবত্তা নেই। প্রাণের গভীরতায় ফ্যাশন পাল্টায় না। কোনো বিশিষ্ট ফ্যাশনিস্টদের কথায় ফ্যাশন পরিবর্তিত হয়। হিন্দু ও হিন্দুত্বের বিরোধিতার সঙ্গে প্রাণের বা জ্ঞানের সম্পর্ক নাই। কোনো বিশিষ্টদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে এই ফ্যাশন এসেছে।

হিন্দু ও হিন্দুত্বের বিরোধিতা ও নিন্দা করে অনেকেই গ্রাসাচ্ছাদন করেন, করে থাকেন। তাদের মুখের ভাত কেড়ে নিতে চাই না। শুধু তাদের মূঢ়তা দূর করার জন্য এবং গ্রাসাচ্ছাদনের দ্বিতীয় কোনো পন্থা নেওয়ার জন্য একটি গল্প এই প্রবন্ধের শেষ ভাগে বলছি।

বর্তমানে হিন্দু ও হিন্দুত্বের প্রতিভা সম্পর্কে তাঁদের একটু জ্ঞান দিচ্ছি। এই জ্ঞান দেওয়া আমার ধৃষ্টতা নয়, আমার কর্তব্য। অর্বাচীনদের জ্ঞান দেওয়া প্রাচীনদের কর্তব্য—এই বিচারধারা সকলেই মানেন। এদের বলা দরকার যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আরম্ভ করে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত (যখন খ্রিস্টত্বের বয়স ১২০০ বছর এবং ইসলামত্বের বয়স ৬০০ বছর) ভারতের হিন্দু প্রতিভার বিকাশ বিশ্বে অনন্য ছিল। ১২০০ শতাব্দী থেকে ভারতে মুসলমান আধিপত্যের কারণে সেই বিকাশ রুদ্ধ হয়ে গেছিল।

দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বিশ্বের কোনো দেশেই ব্যাস ও বাল্মীকির মতো মহাকবি জন্মগ্রহণ করেননি। কালিদাস, ভবভূতির মতো কবিও কেউ ছিলেন না। শূদ্রকের মতো নাট্যকার, বিষ্ণু শর্মার মতো ছোটো গল্প লেখক, পাণিনি ও কাত্যায়নের মতো বৈয়াকরণিক, পিঙ্গলের মতো ছন্দ শাস্ত্রবিদ অন্য কোনো দেশেই ছিলেন না। ছিলেন না যাজ্ঞবল্ক্য, গৌতম ও শঙ্করের মতো দার্শনিক। আর্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করাচার্যের মতো জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞ তখনও বিশ্বের কোনো দেশেই ছিলেন না। চরক ও শুশ্রুতের মতো চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ, কৌটিল্যের মতো রাজনীতি ও অর্থশাস্ত্রবিদ এবং নাগার্জুনের মতো রসায়নশাস্ত্রবিদ কোথাও ছিলেন না। দিল্লির দ্রষ্টব্য অশোকস্তম্ভের ইস্পাত এবং অজন্তার ফ্রেসকো রং আজও অনাবিষ্কৃত। শিল্পকলা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য ভারতের মতো অন্য কোথাও ছিল না। ছিল না তক্ষশীলা নালন্দা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়।

> **হিন্দু ও হিন্দুত্বের বিরোধিতা ও নিন্দা করে অনেকেই গ্রাসাচ্ছাদন করেন, করে থাকেন।... হিন্দু ধর্ম আবর্তিত ধর্ম, প্রবর্তিত নয়। হিন্দু ধর্মে কোনো বিশেষ ব্যক্তি, বিশেষ গ্রন্থ ও বিশেষ উপাসনা পদ্ধতি নির্ভর নয়। এই ধর্মের কোনো প্রবর্তক বিশেষ ব্যক্তি নেই, কোনো একটি বিশেষ ধর্মগ্রন্থও নেই, নেই কোনো বিশেষ উপাসনা পদ্ধতি। এটি যেমন গভীর, তেমনই বিশাল। এর নিন্দা করা মূঢ়তা।**

এত ধর্ম, দর্শন এবং এত ধর্ম, সম্প্রদায়ও অন্যত্র পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষের প্রভাব ছিল সমগ্র পূর্ব উত্তর ও পূর্ব দক্ষিণে। এছাড়াও মধ্য এশিয়ায়। দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতের অনন্যতার আলোচনা এ প্রবন্ধে সম্ভব নয়। কৌতূহলীরা India's contribution to World thought and culture. (Vivekananda Rock Memorial কর্তৃক ১৯৬১ সালে প্রকাশিত), পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রণীত প্রাচীন ভারতের সভ্যতার ইতিহাস, এই লেখক প্রণীত ভারতের প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস (দুটি বই তুহিনা পাবলিশার্স, কলকাতা) পড়ে নিতে পারেন। পড়ে নিলে নিজেকে হিন্দু এবং ভারতীয় ভেবে গর্ববোধ করবেন। অর্বাচীন থাকবেন না। ফ্যাশনিস্টদের প্রবর্তিত কোনো ফ্যাশনও আপনাকে প্রভাবিত করতে পারবে না। হিন্দু ও হিন্দুত্বের নিন্দাবাদীরা সবসময় যে সৎভাবে, আপন বিশ্বাসের ভিত্তিতে নিন্দা করেন তা নয়। শোনা যায়, এবং বিশ্বাস করার কারণ আছে যে জর্জ সরোস এবং তাঁর মতো যারা আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী এবং যারা প্যান ইস্‌লামিক প্রভাবান্বিত, তারা (ব্যক্তি, সংবাদমাধ্যম, সাংবাদিক, বিদ্বমূল প্রমুখ) অর্থের বিনিময়ে এই কাজটি করেন—যে গাছের ডালে বসে আছেন সেই গাছটিই কর্তনের কাজে রত থাকেন। এঁরা কখনও বিশ্লেষণ করে দেখাতে

ও প্রমাণ করতে পারেননি যে, হিন্দু ও হিন্দুত্ব নিন্দনীয় অথবা হিন্দুত্বের মধ্যে কোনো সাম্প্রদায়িকতা আছে। এরা কিছু কথা নিরন্তর বলে যান এবং ভাবেন এই কথাগুলি (অবশ্যই মিথ্যা) বারংবার বলতে থাকলে সাধারণের কাছে তাই-ই সত্য বলে মনে হবে।

হিটলারের নাৎসিপার্টির প্রচার প্রমুখ গোয়েবল্‌স্ এই রকমই বলেছিলেন—'একই বিষয় যদি বারবার উচ্চারণ করা হয় এবং পুনরাবৃত্তিটি যদি যথেষ্ট মাত্রায় ঘটে, তবে জনগণের মনেও ঢুকিয়ে দেওয়া যায় যে, একটি চতুর্ভুজ আসলে একটি বৃত্ত।'

আমরা 'দশচক্রে ভগবান ভূত' প্রবাদটি জানি। এছাড়া সেই গল্পটি যাতে ধূর্তরা ব্রাহ্মণকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছিল যে তার কাঁধের ছাগলটি একটি কুকুর।

পৃথিবীতে আমরা অনেকগুলি দেশেরই প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির কথা পড়েছি, মিউজিয়ামে দেখেওছি। গ্রিস, রোম, মিশর, মেসোপটেমিয়া (এখন বহুধা বিভক্ত) প্রভৃতি দেশ তাদের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সামান্যতম অংশও বর্তমানে অনুসরণ করে না। সেই সব দেশে খ্রিস্টান অথবা ইসলামের আক্রমণ ঘটেছিল। যে সব প্রাচীন দেশে খিস্টান আক্রমণ হয়েছিল সেই সব দেশ এখন এই দু'হাজার বছরের খ্রিস্টীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিই অনুসরণ করে। এই সব দেশগুলির মধ্যে বিশেষভাবে মনে পড়ে গ্রিস ও রোমের কথা। আবার যে দেশগুলি ইসলামের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল—তারা ওই দেড়হাজার বছরের ইসলামি রীতিনীতি পালন করে চলে। এই দেশগুলির মধ্যে বিশেষ করে মিশর ও বর্তমানে বহুধা বিভক্ত মেসোপটেমিয়ার নাম মনে পড়ে। এইসব দেশের মানুষরা এখন তাদের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কহীন। আক্রমণকারীদের প্রদত্ত রীতিনীতি তারা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে।

অপরদিকে ভারতবর্ষও ইসলাম ও খ্রিস্টানদের দ্বারা এবং অন্যান্য কিছু বিদেশি শক্তির দ্বারাও আক্রান্ত হয়েছিল। ইসলাম ও খ্রিস্টান শত শত বছর চেষ্টা করেছে ভারতবর্ষকে ইসলামি দেশ বা খ্রিস্টান দেশে পরিণত করার। সেই ৩২৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে বিদেশিরা ভারত আক্রমণ শুরু করে। এই বিদেশি আক্রমণকারীদের অনেকেই ভারতীয় হয়ে গেলেও খ্রিস্টান ও ইসলামিরা ভারতীয় হয়ে যায়নি। শক, হুন এক দেহে লীন হয়েছে ঠিকই, কিন্তু পাঠান মোগল কখনও নয়। তারা এদেশে বাস করে যাবতীয় সুযোগ সুবিধা পায়, 'সংখ্যালঘু' নামে বিশেষ সুবিধা পায়। তবু এরা এদেশের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেনি। সর্বদাই নিজেদের স্বতন্ত্রতা জাহির করতে থাকে। অন্যদের আক্রমণও করে নিজেদের উপাসনা পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে। খ্রিস্টানদের ক্ষেত্রে বর্তমানে বিষয়টি এতটা মারাত্মক না হলেও ইসলামিদের ক্ষেত্রে এই মারাত্মক মনোভাব সবসময়ই ছিল, এখনও আছে। এরা ভারতবর্ষকে নিজেদের পবিত্রভূমি ভাবে না। এক সময় এরা ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথক দেশ গড়েছে ভারতেরই অংশে (১৯৪৭)। এখনও যারা আছে তাদের অনেকেই আবার ভারতের মধ্যেই আর একটা নিজেদের ধর্মীয় দেশ চাইছে।

ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্ম এই তিনের মহত্ত্ব এখানেই যে এই প্রাচীন দেশটি অদ্যাপিও তার নিজস্বতা বজায় রেখেছে, রেখে চলেছে। এটা সম্ভব হয়েছে একমাত্র হিন্দু ও হিন্দুত্বের কারণে। ইসলামি ও খ্রিস্টানরা বাইরে থেকে এদেশে এসেছে। ভারতের হিন্দুরা বরাবরই এই ভৌগোলিক খণ্ডের অধিবাসী। ভারতবর্ষের যে অংশগুলি নিয়ে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ গঠিত হয়েছে, লক্ষ্য করে দেখুন, তারা নিজস্ব ভারতীয়তা হারিয়ে অন্যদেশীয় রীতিনীতি গ্রহণ করছে। ভারতের প্রাচীনত্ব ও ধারাবাহিকতা দুটিই আছে। উল্লিখিত অন্য দেশগুলির প্রাচীনত্ব আছে। ধারাবাহিকতা নাই।

শেষ ভাগে একটি গল্প বলব। 'গল্প' বলছি বটে তবে এটা ঘটনা। অনেকের চোখ খুলে দিতে পারে যদি তারা অন্ধ না হয়ে থাকে বা জন্ডিস রোগগ্রস্ত না হয়ে থাকে। আমি যে শহরে থাকি সেখানে অনেকগুলি ছাগল ও মুরগির মাংসের দোকান আছে। প্রধানত গুমটি ঘর। আমি সেই দোকানদারদের একজনের দোকান থেকেই বারবার মাংস কিনে থাকি। সে প্রতিদিনই পাঁচ-ছয়টি ছাগল ভ্যান রিকশায় শুইয়ে দিয়ে বেঁধে নিয়ে আসে যাতে সেগুলি রিকশা থেকে পড়ে না যায়। ছাগলগুলি ভাবে হেঁটে হেঁটে পা ব্যথা হয়ে যায়, লোকটি কত ভালো মানুষ--রিকশায় করে নিয়ে যাচ্ছে—আবার খাদ্য হিসাবে মুখের সামনে বটপাতার ডালও রেখেছে।

সে রিকশা থেকে নামিয়ে নিজের গুমটির সামনে ছাগলগুলি বেঁধে রাখে। তাদের মুখের সামনে বটপাতার ডাল ঝুলিয়ে রাখে। ছাগগুলি আরাম করে বটপাতা খায়। দোকানদারের প্রতি তাদের চোখে কৃতজ্ঞতা ঝরে পড়ে। এবার মাংস কেনার খরিদ্দাররা ভিড় করেছেন। তাদের পছন্দের একটি ছাগল সে জবাই করে। অন্য ছাগলগুলি নির্বিকারে বটপাতাই খেতে থাকে। আবার একটি ছাগল জবাই করে। বাকি ছাগলগুলি একইভাবে বটপাতা খেতে থাকে। এখনও নির্বিকার। এক এক করে খরিদ্দারদের চাহিদামতো সে সবগুলি ছাগল জবাই করল। সর্বশেষ ছাগলটিও আগের মতো মনের সুখে নির্বিকার ভাবে বটপাতাই খাচ্ছিল। সঙ্গীগুলি যে কোথায় গেল তা নিয়ে কোনো হেলদোল ছিল না। দিনের শেষে দোকানদার সেই শেষ ছাগলটির মুখ থেকে বটাপাতা সরিয়ে দিয়ে তাকেও জবাই করল।

ভারতবর্ষের গৌরব এদেশের মূল অধিবাসী হিন্দুরা বটপাতা খাওয়া ছাগল ছিলেন না। তারা নিজেদের ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষায় বীরের মতো যুদ্ধ করেছেন, আক্রমণকারী বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে প্রাণ দিয়েও নিজস্বতা রক্ষা করেছেন। আমরা তাঁদেরই উত্তরাধিকারী। ধর্ম ও সংস্কৃতির এই বীর যোদ্ধারা না থাকলে আমরাও কোনো খ্রিস্ট বা ইসলামি দেশের নাগরিক হয়ে যেতাম।

সেই আলেকজান্ডারের সময় থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত প্রায় ২৩০০ বছর ধরে ভারতীয় হিন্দুরা স্বাধীনতার যুদ্ধ করেছেন— ধর্মীয় স্বাধীনতা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বাধীনতা। এবং সেই যুদ্ধে তাঁরা শতভাগ সফল। আমরাই তার প্রমাণ। রাজনৈতিক স্বাধীনতা হয়তো অনেক সময় ধরে ছিল না। পৃথিবীতে এমন কোনো দেশ আছে যে দেশ ২৩০০ বছর ধরে ধর্ম ও সংস্কৃতির স্বাধীনতার যুদ্ধ করেছে এবং সফল হয়েছে? এটা সম্ভব হয়েছে ভারতের সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের কারণে। সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছে হাজার হাজার বছর ধরে।

অর্থ, যশ ও প্রতিপত্তির লোভে আজ যে হিন্দুরা বটপাতা খেয়ে চলেছেন—তাঁরা জানবেন যে প্রয়োজনে তাদের জবাই-ই করা হবে, রিকশায় চাপানো হবে না, বটপাতাও কেড়ে নেওয়া হবে। হিন্দু ধর্ম আবর্তিত ধর্ম, প্রবর্তিত নয়। হিন্দু ধর্মে কোনো বিশেষ ব্যক্তি, বিশেষ গ্রন্থ ও বিশেষ উপাসনা পদ্ধতি নির্ভর নয়। এই ধর্মের কোনো প্রবর্তক বিশেষ ব্যক্তি নেই, কোনো একটি বিশেষ ধর্মগ্রন্থও নেই, নেই কোনো বিশেষ উপাসনা পদ্ধতি। এটি যেমন গভীর, তেমনই বিশাল। এর নিন্দা করা মূঢ়তা।

এ রাজ্যে করোনার সব তথ্য লুকোনো শাড়ির আঁচলে

সুজিত রায়

না, সংখ্যাতত্ত্বের কচকচানিতে গিয়ে লাভ নেই। কারণ যে কোনো মহামারীতেই মৃত্যু একটা সংখ্যা মাত্র। মৃত্যু মানে প্রিয়জনকে হারানো নয়। কান্নাও নয়। এই সত্যটা চিরন্তন। '৭৬-এর মন্বন্তরেও ছিল এটাই সত্য। '৪৬-এর নরসংহারেও ছিল এটাই সত্য। এটাই সত্য এবারও এই করোনা ভাইরাসের আক্রমণে বিশ্বব্যাপী মহামারীতেও।

সমস্যা সেটা নয়। সমস্যা হলো— মৃত্যুটা বা আক্রান্তের সংখ্যাটাকে শাড়ির আঁচলের তলায় লুকিয়ে ফেলার মতো অপরাধ। গোটা বিশ্ব জুড়ে করোনা ভাইরাসের দাপাদাপি এবং লক্ষ লক্ষ যমদূতের হা-হা হি-হি-তে যখন কম্পমান ভূলোক, যখন কেউই সংখ্যা লুকিয়ে মুখ কালো করছেন না, এমনকী ইতালির মতো চিকিৎসাবিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতম দেশও, তখন পশ্চিমবঙ্গই একমাত্র একটি রাজ্য গুগল ম্যাপে যার অবস্থান বিন্দুর চেয়েও ছোটো, সে অবাধে নির্লজ্জের মতো লুকিয়ে চলেছে করোনা তথ্য।

মৃত্যু কত? বিশ্বের সবচেয়ে কম।

আক্রান্ত কত? বিশ্বের সবচেয়ে কম।

বাড়ি ফিরেছেন কতজন? বিশ্বে সবচেয়ে বেশি।

চিকিৎসা হয়েছে কতজনের? বিশ্বের সবচেয়ে বেশি।

ব্যাপারটা অনেকটা এরকম। অথচ আপনি আমি এমনকী আপনার আমার বাড়ির সদ্য জ্ঞানপ্রাপ্ত শিশুটিও জানে, কোন পাড়ায় কতজন করোনায় আক্রান্ত। কোন পাড়ার কতজন করোনায় মারা গেছে। কোন পাড়ায় করোনা আক্রান্ত রোগীর ডেথ সার্টিফিকেটে লেখা হয়েছে নিউমোনিয়া অথবা ব্রঙ্কাইটিস। কোন পাড়ার কোন ডাক্তার, কোন নার্স, কোন স্বাস্থ্যকর্মী আচমকা শ্বাসকষ্টে ভুগছেন। কোন পাড়ার কোন বস্তিতে অবাধে চলছে মেলামেশার মহোৎসব। কোন পাড়ায় লকডাউনের রক্তচক্ষুকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে নিজেরাই রক্তচক্ষুর কবলে পড়ে 'রেড জোনের' অধিবাসী হয়ে গেছেন। রাজ্যের কোন কোন হাসপাতালের কতজন চিকিৎসক, নার্স চলে গেছেন কোয়ারেন্টাইনে। কোনো হাসপাতালের কতগুলি ওয়ার্ড বন্ধ হয়ে গেছে। কোন হাসপাতালে প্রসূতি শিশু প্রসব করতে গিয়ে করোনার বিষে বিষাক্ত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন। কতজন মানুষের করোনা টেস্ট হয়েছে। কতজন স্বাস্থ্যকর্মী বিশেষ পোশাক পিপিই এবং এন-৯০ মাস্ক পেয়েছেন। কোন রাজ্য করোনার সংক্রমণে সবচেয়ে বেশি সফল। কোন কোন রাজ্য ক্রমাগত সাফল্যের পথে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে দুঃখজনক ঘটনা হলো এটাই— সবাই সব জানে। শুধু সরকার জানায় না। সরকার যেটা জানায় তা যে সাবলীল মিথ্যা, মানুষ সেটা জানে বলে সরকারি তথ্য বিশ্বাস করে না। আর তার ফলটা কী হচ্ছে?

রাজ্যটা চালান যিনি তাঁর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যিনি সব জানেন। সব বোঝেন। সব জেনে সব বুঝেও তথ্য লুকোন শাড়ির আঁচলে। মুসলমান মহল্লায় মহোৎসব হয় করোনার লকডাউনকে উপেক্ষা করে। কোনও সংবাদপত্র সত্যি কথাটা লিখলে তাঁকে হুমকি শুনতে হয়। আর বিদেশের সংবাদপত্র নিউইয়র্ক টাইমস, সানডে গার্ডিয়ানের পাতায় পাতায় ছাপা হয়— 'Bengal sitting on a coronavirus time bomb.'

রাজ্যে প্রতিদিন করোনা ভাইরাসের দাপাদাপি লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে পাড়ায় পাড়ায়। অথচ আমি আপনি কেউই জানি না, আমরা কে করোনা পজিটিভ, কে নেগেটিভ। কারণ এ রাজ্যেই টেস্ট হয়েছে এখনও পর্যন্ত বিশ্বে সবচেয়ে কম। কেউ কখনও শুনেছেন, রোগীর চিকিৎসা করেন একজন ডাক্তার আর ডেথ সার্টিফিকেট দেয় সরকারি কমিটি? কেউ কখনও দেখেছেন, হাসপাতালে পৌঁছে চূড়ান্ত শ্বাসকষ্টে এবং জ্বরে আক্রান্ত রোগীকেও হাসপাতাল ফিরিয়ে দিয়ে বলছে, ঘরে যান। গৃহবন্দি থাকুন।

পশ্চিমবঙ্গ সেই আশ্চর্য রাজ্য যেখানে কেন্দ্রের পাঠানো ৯ লক্ষেরও বেশি টন চাল পচছে এফসিআই গুদামে। অথচ রাজ্যে গরিবের হাতে পৌঁছছে না রেশনের চাল। কোথাও শুনেছেন, করোনা হচ্ছে বলে ওষুধের দোকান থেকে উধাও শিশু খাদ্য, সদ্যোজাত শিশুর ভ্যাকসিন, ডায়াবেটিস আক্রান্ত বৃদ্ধ-বৃদ্ধার ইনসুলিন-সহ যাবতীয় জীবনদায়ী ওষুধ? কোথাও শুনেছেন, এতৎ সত্ত্বেও রাজ্য সরকার টেলিভিশন চ্যানেলগুলিতে ঘনঘন বিজ্ঞাপনের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে প্রচার চালিয়ে

দিল্লির তবলিগি-জামাত যোগে দেশে করোনা আক্রান্ত ৩০ শতাংশ

ভারতে করোনা আক্রান্তের ৩০ শতাংশই দিল্লির নিজামুদ্দিন মরকজে অনুষ্ঠিত তবলিগি জামাতের অংশগ্রহণকারী। না, এ হিসাব আমাদের মনগড়া নয়। হিসাবটা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের। আর তা আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে সংবাদসংস্থা পিটিআইয়ের মাধ্যমে।

১৯ এপ্রিল পর্যন্ত পাওয়া তথ্যের হিসাবমতো, ভারতবর্ষে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১৬,৩৬৫। স্বাস্থ্য দপ্তরের যুগ্ম সচিব লব আগরওয়ালের তথ্য হলো : এর মধ্যে ৪২৯১ জনই তবলিগি সমাবেশে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশ নিয়ছিলেন। এদের থেকেই ২৩টি রাজ্য ও বিভিন্ন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে করোনা ছড়িয়ে পড়েছে। এই জামাত কাণ্ডের সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে তামিলনাড়ুতে যেখানে ৮৪ শতাংশ করোনা আক্রান্তই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন নিজামুদ্দিন সমাবেশে। দিল্লিতে এর প্রভাবে আক্রান্ত ৬৩ শতাংশ, অসমে ৯১ শতাংশ, উত্তরপ্রদেশে ৬১ শতাংশ, আন্দামান ও নিকোবর ৮৩ শতাংশ আক্রান্তের বৃদ্ধি ওই জমাতের যোগেই।

পশ্চিমবঙ্গের ৭৩ জন দিল্লির জামাতে অংশ নিয়েছিলেন। এদের মধ্যে সরকারি হিসেবে ৫৪ জনকে সনাক্ত করে কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয় নিউ টাউনের হজ হাউসে। সেখানে তারা নিয়মকানুন এবং বিধি না মেনে যথেচ্ছাচার শুরু করেন, এমনকী স্বাস্থ্যকর্মীদের গায়ে থুতুও ছিটোতে শুরু করেন। নার্সদের অশ্লীল ইঙ্গিত করেন। এর প্রতিবাদে সোচ্চার হয় গোটা দেশ। শুধু চুপচাপ ছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। মুখ্যমন্ত্রী রা-কাড়েননি। বাকি ১৯ জন কোথায় তা সরকার বলেনি। এই কলকাতা বিমানবন্দরে পরে ১৫ জন বিদেশি মুসলমান ইমাম ধরা পড়েন যারা চেষ্টা করেছিলেন বিশেষ বিমান ধরে মালয়েশিয়ায় পালাতে। এরাও সম্ভবত দিল্লি থেকে পালিয়ে এসে এখানে গা ঢাকা দিয়েছিলেন। এখন জামাত-যোগে আক্রান্তের সংখ্যা কত বলা মুশকিল। কারণ এ রাজ্যে মেটিয়াবুরুজ, রাজাবাজার, বেলগাছিয়া, তপসিয়া-সহ মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মুসলমানরা লকডাউনকে একেবারেই মানছেন না। এ নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মুখে বিশেষভাবে কোনো শব্দ শোনা যায়নি।

তাই প্রশ্ন উঠেছে— করোনার মতো ভয়াবহ মহামারীতেও কী মুখ্যমন্ত্রী সংখ্যালঘু তোষণের রাজনীতিতে প্রশ্রয় দিয়ে যাবেন? ২৩ কোটি মুসলমানের জন্য দেশের বাকি ১১৬ কোটি জনতা হবেন করোনা আক্রান্ত? জবাব দেবার দায় কী রাজ্য সরকারের নেই? ■

যাচ্ছেন, পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য এবং ওষুধের কোনো অভাব নেই?

হ্যাঁ, এসব কাকেশ্বর কুচকুচের আবোল তাবোল হযবরল কাণ্ড কারখানা দেখতে পাবেন, শুনতে পাবেন শুধু একটি লোকেশনেই। তার নাম পশ্চিমবঙ্গ। কারণ রাজ্যটা চালান যিনি তাঁর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যিনি সব জানেন। সব বোঝেন। সব জেনে সব বুঝেও তথ্য লুকোন শাড়ির আঁচলে। মুসলমান মহল্লায় মহোৎসব হয় করোনার লকডাউনকে উপেক্ষা করে। কোনও সংবাদপত্র সত্যি কথাটা লিখলে তাঁকে হুমকি শুনতে হয়। আর বিদেশের সংবাদপত্র নিউইয়র্ক টাইমস, সানডে গার্ডিয়ানের পাতায় পাতায় ছাপা হয়— 'Bengal sitting on a coronavirus time bomb.'

আজ্ঞে হ্যাঁ, এটাই আসল ছবি। আমরা বসে আছি টাইম বোমার ওপর। এভাবে চললে, সেই বোমা ফাটতে আর বেশি সময় লাগবে না। দিদি, আমরা জানি, আপনি সেদিনও বলবেন – 'করোনা সংক্রমণ রুখতেই আমরাই ফার্স্ট।'

আহা! কী আনন্দ আকাশে বাতসে! ■

রাজ্য সরকারের হাজারো দোষ ঢাকতেই কি করোনা তথ্য গোপন ?

সংক্রমণের আসল হিসেব বেরিয়ে পড়লে, সরকারের ব্যর্থতা প্রকাশ্যে চলে আসতে পারে, এমন আশঙ্কা থেকেই তথ্য গোপনের বিষয়টা আসতে পারে বলে মনে করছে বিরোধী রাজনৈতিক মহলের একাংশ। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর দোহাই দিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলকে আটকানোর প্রচেষ্টাও সন্দেহের উর্ধ্বে নয়।

বিশ্বপ্রিয় দাস

আমাদের রাজ্যে কতজন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত, সেই তথ্য জানার অধিকার কী সাধারণ মানুষের আছে? হয়তো ভাববেন, কেন থাকবে না? সব রাজ্যের তথ্যই পাওয়া যাচ্ছে? তাহলে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে পাওয়া যাচ্ছে না কেন? করোনা নিয়ে একটি আপডেট ডেটা পাবার জন্য, অনেকগুলি অ্যাপ এখন হাতের কাছে আছে, সেগুলির সবই পশ্চিমবঙ্গের সঠিক তথ্য দিতে পারছে না। এই তথ্য জানা যাচ্ছে না একটি মাত্র কারণে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর অলিখিত করোনার তথ্যের ক্ষেত্রে জরুরি অবস্থা ঘোষণায়। আর এই বিষয়ে যে তথ্য রাজ্য সরকারের তরফে দেওয়া হবে সেটাকেই আসল তথ্য হিসাবে প্রকাশ করতে হবে। এমনটাই নিদান দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী।

বর্তমান করোনা পরিস্থিতি ও তথ্য গোপন নিয়ে একযোগে সরব হয়েছে সরকার বিরোধী সব কটি দল। তবে সব থেকে সরব বিজেপি। বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে বলেছেন যে এই তথ্য গোপনর ক্ষেত্রে আগের বামেদের সঙ্গে বর্তমান তৃণমূলের মিল এক জায়গায়। নন্দীগ্রামে সেই সময় যেমন সিপিএম লাশ গায়েব করেছিল, এখন করোনায় সেভাবেই লাশ গায়েব করছে তৃণমূল। এই কথাকে কেন্দ্র করে বিতর্ক চরমে উঠেছে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে। বিজেপি সাংসদ আগেও সরব হয়েছিলেন করোনা আক্রান্তের সঠিক তথ্য না দেবার বিষয়ে অভিযোগ তুলে। এক সঙ্গে একই বিষয়ে সরব বাম ও কংগ্রেস। দিলীপ ঘোষ বলেন, রাজ্য যে তথ্য সামনে এনেছে, তার থেকে অন্তত চারগুণ মানুষ আক্রান্ত। এই বিষয়ে প্রশাসনের তরফে ভয় দেখিয়ে ডাক্তার , হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, পুলিশ-প্রশাসনের মুখ বন্ধ রাখা হয়েছে। এমনকী সংবাদমাধ্যমেরও কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে। অন্যদিকে মৃত্যুর সার্টিফিকেট দেবার ব্যাপারেও নানা বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। যেমনটি এর আগে ডেঙ্গু আক্রান্তে মৃত্যুর বিষয়ে আরোপ করা হয়েছিল।

কেন তথ্য গোপন করার এই খেলায় নেমেছে প্রশাসন? সাধারণ মানুষের বক্তব্য, এই তথ্য গোপনের ফলে পরিস্থিতির অবনতি বা উন্নতির সঠিক তথ্যটাই প্রকাশ হচ্ছে না। আর সেই কারণে, এই মারণ ভাইরাসকে কীভাবে আটকানো যাবে, সেই গেম প্ল্যান ঠিক করাও যাবে না। কোথায় এই রোগের সংক্রমণ বেশি, আর কোথায় কম? সেই তথ্য চেপে যাওয়ার ফলে, সাধারণ মানুষ অজান্তেই মৃত্যু পরোয়ানা সই করে ফেলছেন, এমনটাও ভেবে ভয় পাচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

তথ্য গোপনের অভিযোগ আরও দানা বেঁধেছে, যখন রাজ্যের নানা জায়গা থেকে এই করোনা নিয়ে নানা অভিযোগ উঠছে। যেমন, হাতে কিট থাকা সত্ত্বেও করোনা পরীক্ষা করা হচ্ছে সামান্য। নাইসেডের তরফেই এই অভিযোগ করা হয়েছে। অথচ কোয়েরেন্টাইনে থাকা মানুষজনের হিসেব ও তাদের জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করার যদি মিল করানো হয়, এই হিসেব মিলবে না।

গত ১৭ এপ্রিল, সাড়ে তিনটায় বামনেতা ও বিধায়ক সুজন চক্রবর্তী তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া পেজে হাওড়া জেলার সাতটি করোনাজনিত কারণে মৃত্যুর বিষয়ে একটি

তালিকা প্রকাশ করে বলেন, এই সাতের মধ্যে মাত্র তিনটির হিসেব তালিকায় স্থান পেয়েছে। বাকি চারটি গেল কোথায়?

কেন এই তথ্য গোপনের খেলা?

১। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের গরিমা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মাঝে মাঝেই নানা কথা বলেন। কিন্তু তাঁর এই বিষয়টা কতটা যে ঠুনকো, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের পরিকাঠামো ও চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে তিনি গলা ফাটান, সেই পরিকাঠামো বলে যে কিছুই নেই সেটা প্রমাণ হয়ে যাবে, আর ঢাল তলোয়ার হীন সীমিত ক্ষমতার চিকিৎসা পরিকাঠামোর কারণে আমাদের রাজ্যে সংক্রমণ যে ঊর্ধ্বগতি সম্পন্ন হয়ে উঠেছে সেটা প্রমাণিত হয়ে যাবে।

২। করোনা নিয়ে যখন দেশের প্রধানমন্ত্রী সব রাজ্যকে সাবধান করলেন, তখন তিনি এড়িয়ে গেলেন। বললেন সিএএ বা এনসিআর নিয়ে সারা দেশে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছে, তার থেকে চোখ ঘোরাতেই এই করোনাকে সামনে আনা। পরে যে এটা ভুল, সেটা প্রমাণিত যখন হলো, আর মুখ্যমন্ত্রী যখন বুঝতে পারলেন যে তিনি রাজনীতি করতে গিয়ে বিষয়টাতে গুরুত্ব নিয়ে বড্ড দেরি হয়ে গেছে, সেই ভুল ঢাকতে তিনি তথ্য ঢাকার বিষয়টাতে মন দিতে শুরু করলেন। ততদিনে যা হবার তাই হয়ে গেছে। সংক্রমণের থাবা আঘাত করেছে আমাদের সাধারণ মানুষকে।

৩। প্রশাসনের ঢিলেঢালা মনোভাব, আর কেন্দ্রের ঘাড়ে দোষ চাপানোর রাজনীতির খেলা খেলতে গিয়েও তিনি লেজেগোবরে হয়ে গেলেন। করোনা পরীক্ষা করাবার মতো পর্যাপ্ত কিট নেই, সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্র পাঠিয়ে দিল। টাকার অভাব, পাওনা টাকা চাইলেন, সেটাও সামান্য হলেও এই পরিস্থিতিতে মিটিয়ে দিল কেন্দ্র। এছাড়াও করোনা পরিস্থিতি সামালাবার জন্য পরিকাঠামোর প্রয়োজনে সব রকম সাহায্য করতে শুরু করে দিল। ফলে যা হবার তাই হলো, এবার কী করবেন তিনি? সংক্রমণের আসল হিসেব বেরিয়ে পড়লে, সরকারের ব্যর্থতা প্রকাশ্যে চলে আসতে পারে, এমন আশঙ্কা থেকেই তথ্য গোপনের বিষয়টা আসতে পারে বলে মনে করছে বিরোধী রাজনৈতিক মহলের একাংশ।

৪। এদিকে সারা দেশের কাছে নিজের একটা ভাবমূর্তি তৈরির লক্ষ্যে, করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যে মমতা সরকার একটা মাইলস্টোন তৈরি করেছে, সেটাকে প্রমাণ করার লক্ষ্যেই তথ্য চেপে যাবার প্রবণতা দেখা দিয়েছে বলে মনে করছে একটি মহল।

৫। এদিকে বারে বারে লকডাউন না মানার তালিকায় শাসক দলের ছত্রছায়ায় থাকায় বেশ কিছু সংখ্যালঘু অঞ্চলের নাম উঠে এসেছে বিশেষ করে কলকাতার। সেখানে ইতিমধ্যেই সংক্রমণের মাত্রাটা কেমন, সেটা নিয়ে চিন্তিত কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক, আলাদা করে রাজ্য সরকারকে ওই অঞ্চলগুলিতে লকডাউন মানতে বাধ্য করার জন্য একটি নির্দেশিকা দিতে বাধ্য হয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। ফলে এই ক্ষেত্রেও সঠিক তথ্য সামনে আসলে, সেটি যে খুব একটা সুখকর হবে না সেটাও জানে প্রশাসন। তাই চেপে যাওয়াটাই সঠিক পথ, এমনটাই মনে করছেন অনেকে।

মুখ্যমন্ত্রী প্রচারের আলোয় থাকবেন বলে, কখনও রাস্তায় দাগ কাটছেন, কখন রেশন দোকানে হানা দিচ্ছেন। সঙ্গে এক ঝাঁক স্তাবক সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধি ও তাঁর উল্টোদিকে থাকা সাধারণ মানুষ। তারা কতটা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মানছেন ঈশ্বরই জানেন। এখান থেকেও যে ছড়াতে পারে সংক্রমণ সেটা কী মুখ্যমন্ত্রী জানেন না? হয়তো জানেন। তবুও জেনে শুনেও নিজেকে প্রচারের আলোয় রাখার তাগিদ।

এদিকে মুখ্যমন্ত্রী মুখে বলছেন এক আর কাজে করছেন আর এক। তিনি প্রচারের আলোয় সব সময় থাকবেন বলে, কখনও রাস্তায় দাগ কাটছেন, কখন রেশন দোকানে হানা দিচ্ছেন। সঙ্গে ঘুরছে এক ঝাঁক স্তাবক সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধি ও তাঁর উল্টোদিকে থাকা সাধারণ মানুষগুলি। তারা কতটা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মানছেন সেটা যারা লাইভ দেখেছেন তাঁর অভিযানগুলি, তারা বলতেই পারবেন। রেডজোন ভবানীপুরে রেশন দোকানে অভিযানের দিন যারা দেখেছেন, তারা বলতেই পারবেন। এখান থেকেও তো ছড়াতে পারে সংক্রমণ, সেটা কী মুখ্যমন্ত্রী জানেন না? হয়তো জানেন। তবুও জেনে শুনেও মানুষের পাশে। শুধু নিজেকে প্রচারের আলোয় রাখার জন্য। বাকি সব গৌণ।

মধ্যপ্রদেশের ইন্দৌরে স্বাস্থ্য কর্মীদের উপর মৌলবাদীদের আক্রমণ।

মৌলবাদী ধর্মীয় সংকীর্ণতা এবং বিদ্বেষ করোনা ভাইরাস থেকেও ভয়ানক

রঞ্জন কুমার দে

করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় ভারত এখন পর্যন্ত যথেষ্ট সফল এবং মোটামুটিভাবে নিরাপদ। আমেরিকা-সহ ইউরোপের বিভিন্ন প্রতাপশালী দেশসমূহ প্রধানমন্ত্রী মোদীর সহযোগিতা চেয়েছে, স্বাস্থ্য সংস্থা 'হু' খোদ বিশাল জনসংখ্যা বিশিষ্ট ভারতকে করোনা রোধের বলিষ্ঠ পদক্ষেপে বাহবা দিতে বাধ্য হয়েছে। ভারতবর্ষের মতো উন্নয়নশীল দেশের সাধারণ মানুষের করুণ অবস্থা সহজে বোধগম্য। কিন্তু জীবন থেকে সাময়িক সমস্যা কখনো বৃহত্তর হতে পারে না, সেটা দেশের আর্থিক ক্ষতিই হোক কিংবা ধর্মীয় রীতিনীতি পালনে নিষেধাজ্ঞা। ভারতবর্ষ যখন করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সমস্ত রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ভুলে সমগ্র রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার একযোগে ঝাপিয়ে কাজ করছিল, ঠিক তখনই দিল্লির নিজামুদ্দিনে তবলিগি জামাতিদের ধর্মীয় সমাবেশে করোনা সংক্রমণে দেশের রক্তচাপ বাড়িয়ে দিয়েছে। সরকারি সূত্রমতে দেশের মোট করোনা আক্রান্তের প্রায় ৩০ শতাংশই তবলিগি জামাতের সমাবেশে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিল। তাছাড়াও দেশের ১৭টি রাজ্যে ছড়িয়ে পড়া আক্রান্তদের মধ্যে বিভিন্ন কোয়ারেন্টাইনের (নিভৃতবাস) প্রায় ২২ হাজার আক্রান্তদের সঙ্গে দিল্লির নিজামুদ্দিনের কোনো না কোনো যুগসূত্র ছিল। বিগত একটি সরকারি পরিসংখ্যানে তবলিগি জামাতের সমাবেশে যোগ দেওয়ার প্রায় ১০২৩ জন করোনায় আক্রান্ত চিহ্নিত হয়েছে। দেশের ২৪টি রাজ্যে এবং ৪টি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে দিল্লির জমায়েতে উপস্থিত তবলিগিদের খোঁজে চিরুনি তল্লাশি চলছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের বক্তব্যানুযায়ী প্রতি ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্তদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে যার অন্যতম কারণ তনলিগ-ই-জমায়েত। লকডাউন অন্তের কোনো ইঙ্গিতই দৃশ্যমান নয়, কারণ দেশের বিভিন্ন প্রান্তের তবলিগরা দিল্লির সমাবেশে উপস্থিত হয়েছিল তাদের অনেকে আত্মগোপন করে আছে এবং তাদের সংস্পর্শে রোজ নতুন করে আরও অনেক আক্রান্ত হচ্ছে। তামিলনাড়ুতে করোনা পজিটিভ ৩০৯ জনের ২৬৪ জনই তবলিগি সদস্য, মহারাষ্ট্রে দিল্লির ধর্মীয় সমাবেশে যোগ দেওয়া ১৪০০ জনের মধ্যে ১৩০০ জনকে চিহ্নিত করে কোয়ারেন্টাইনে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ১০০ জন এখনো পলাতক। দিল্লিতে মৃত ২ জন করোনা পজিটিভ দিল্লির সমাবেশে উপস্থিত ছিল এবং এখন পর্যন্ত সেখানের ২১৯ জন করোনায় পজিটিভ আক্রান্ত যাদের মধ্যে ১০৮ জনই তবলিগি জামাতি। তবে প্রতিদিন সেই সংখ্যার পরিবর্তন ঘটেছে। প্রথমাবস্থায় তেলেঙ্গানায় আক্রান্তের সংখ্যা ২০ ছিল, যাদের সবাই দিল্লির জমায়েতের হজির ছিল, অন্ধ্রপ্রদেশে ৮৭ জন করোনা পজিটিভ যাদের মধ্যে ৭০ জন তবলিগি। জম্মু-কাশ্মীরে ২৩ জন করোনা আক্রান্ত যাদের ১০ জন দিল্লির নিজামুদ্দিনে যোগ দিয়েছিল। ১৩ মার্চ থেকে ১৯ মার্চ পর্যন্ত বিভিন্ন দূরন্ত এক্সপ্রেসের প্রতিটি ট্রেনে কয়েক হাজার জন যাত্রী দিল্লির নিজামুদ্দিনের সমাবেশে অংশ নিয়েছিল, এদের মধ্যে কর্ণাটক থেকে মাত্র ৩০০ জন, হরিয়ানায় ৫০৩ জন, মহারাষ্ট্র থেকে ৫৪ জন, গুজরাট থেকে ৭২ জন, পঞ্জাব থেকে ৯ জনকে রেল কর্তৃপক্ষ তবলিগি জমায়েতের অংশগ্রহণকারী সদস্য হিসেবে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছে।

দেশের এই নির্মম পরিস্থিতিতে রাজনেতা থেকে শুরু করে ডাক্তার, পুলিশ, সেনা, নার্স সবাই নিজের জীবনকে বাজি রেখে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যখন করোনা আক্রান্ত কিছু তবলিগি দুর্বৃত্ত দেশের এই সেবকদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পরিবর্তে তাঁদের প্রতি অমর্যাদাপূর্ণ, অশ্লীল আচরণ করছে এবং এই দুর্বৃত্তদের অধিকাংশই দিল্লির নিজামুদ্দিনের জমায়েতের সদস্য। উত্তর-পূর্ব দিল্লির স্বাস্থ্য দপ্তরের অভিযোগ কোয়ারেন্টাইনে থাকা নিজামুদ্দিনের তবলিগিরা চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের ওপর থুতু ছোঁড়ে। একইভাবে

গাজিয়াবাদের আইসোলেশনে ভর্তি তবলিগি জামাতরা হাতপাতালে নগ্ন হয়ে নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে অশালীন আচরই করে, এমনকী এই দুর্বৃত্তরা চিকিৎসাকর্মীদের নিকট নাকি বিড়ি-সিগারেটেরও দাবি রাখে। বিহারে দিল্লির নিজামুদ্দিনের অংশগ্রহণকারী তবলিগি জামাতদের খুঁজতে গিয়ে স্বাস্থ্যকর্মীদের আক্রান্ত হতে হয়। পশ্চিমবঙ্গের তমলুকেও নিজামুদ্দিনে অংশগ্রহণকারী ২৫ বছরের এক যুবককে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে গেলে মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী-সহ গোটা টিমকে হেনস্থা করা হয়, গাড়ি ভাঙচুর করে চালককে মারধর করা হয়। উত্তরপ্রদেশ পুলিশ মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি অশালীন আচরণের জন্য এই তবলিগি জামাতদের বিরুদ্ধে জাতীয় নিরাপত্তা আইনে এফআইআর দায়ের করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু প্রশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আবার এই তবলিগিরা কানপুরের গণেশ শঙ্কর মেমোরিয়াল মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের দিকে থুতু ছিটিয়েছে-- অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

দিল্লির নিজামুদ্দিনের তবলিগি সমাবেশে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এবং রাজ্য সরকার। জমায়েতের উপস্থিত সাত মওলানার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে এফআইআর দায়ের করেছে দিল্লির পুলিশ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকও ফরেনার্স অ্যাক্টের ১৪ নম্বর ধারা অনুযায়ী বিদেশি তবলিগি জামাতিদের বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া শুরু করেছে, কারণ টুরিস্ট ভিসায় এসে কোনো ধর্মীয় প্রচারে অংশ নেওয়া যায় না। এই ধর্মীয় সমাবেশে যোগ দেওয়া ৬৭টি দেশের ৯৬০ জনের ভিসা বাতিল করেছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এবং স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে আগামীদিনে তবলিগ জামাত সম্পর্কিত কোনো সমাবেশের জন্য ভারত আর ভিসা দিবে না। বর্তমান ভারতে যে কটি করোনার নতুন সংক্রমণ হয়েছে তাদের অধিকাংশের সম্পর্ক 'দিল্লির নিজামুদ্দিন'। জামাতে অংশগ্রহণকারী অনেকেই আত্মগোপন করে এখনো আছে এবং যারা কোয়ারেন্টাইনে বা আইসলেশনে আছে তাদের দুর্ব্যবহারে দেশের সাধারণ মানুষ-সহ খোদ সংখ্যালঘু মন্ত্রক অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘুমন্ত্রী মুক্তার আব্বাস নাকাভি তবলিগিকাণ্ডকে তালিবানি অপরাধে আখ্যায়িত করেছেন। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যেখানে করোনা সংক্রমণের আশঙ্কায় নাজেহাল। দুর্ভাগ্যবশত এখনো দিল্লির নিজামুদ্দিনের অনেক তাবলিগব নিখোঁজ । অসমের এক প্রতাপশালী মন্ত্রী তাবলিগদের 'মানব বোমা'য় আখ্যায়িত করেছেন কিন্তু বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা নিজামুদ্দিনের ঘটনাকে 'করোনা জিহাদ' বা 'মরকজ ষড়যন্ত্র' হিসেবে আখ্যায়িত করতে একেবারে নারাজ।

কিন্তু মুষ্টিমেয় ধর্মান্ধ দুর্বৃত্তদের জন্য বিশেষ কোনো সমাজকে সম্পূর্ণ দোষারোপ করাটা ঠিক নয়। বছর ৭৫-এর খালেদা বেগম হজ পালনের যাত্রার জন্য সঞ্চিত ৫ লক্ষ টাকার পুঁজি করোনা মোকাবিলায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সেবাকাজে দান করেন। বুলন্দশহরে করোনা আতঙ্কে হিন্দু বৃদ্ধের সৎকারে যখন কেউ আসছিল না তখন প্রতিবেশী মুসলমানরা সৎকার্য করে। দরিদ্র মুসলমান মহিলার কাফনের কাপড় জোগায় এক হিন্দু যুবক, এটাই আমাদের ভারতবর্ষ। কিন্তু তথাকথিত কতিপয় কিছু ধর্মের ঠিকাদাররা সমাজের সাধারণ মানুষদের ভুল পথে চালিত করে বিভ্রান্ত করে রেখেছে। দিল্লির নিজামুদ্দিন কাণ্ডের মূল পাণ্ডা মৌলানা সাদ এক অডিয়ো বার্তায় বলছে— করোনা ভাইরাসের জন্য নাকি দায়ী মানুষের পাপ, তাই আল্লা ক্ষুব্ধ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের দাবি অতিতেও ভারতের তবলিগি জামাতকে ব্যবহার করেছে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইএস, ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে জামাত-উদ- দাওয়া এবং জৈশ-ই-মহম্মদের মৌলবাদী তত্ত্বের প্রচার। নির্বাসিতা লেখিকা তসলিমা নাসরিন তবলিগি জামাতকে একটি ইসলামি কট্টরপন্থীদের আন্দোলন হিসেবে বর্ণিত করেছেন। আজ এই জামাতের কর্মকাণ্ড উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান এবং কাজকস্তানে নিষিদ্ধ। করোনা সংক্রমণে নিঃসন্দেহে কোনো জাতি বা গোষ্ঠীর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অবশ্যই নয়, তবে মৌলবাদীরা গোঁড়ামির কিছুটা ঊর্ধ্বে উঠে আসতে পারলে দিল্লির নিজামুদ্দিনের কাণ্ডের সূত্রপাতই হতো না এবং পুরো দেশকে এভাবে আতঙ্কে দিন কাটাতেও হতো না। করোনা সংক্রমণের কঠিন সময়েও পাকিস্তান ঘৃণ্য মৌলবাদী হিংসার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি। পাকিস্তানের দৈনিক সংবাদপত্র টেলিগ্রাফ জানায় পাকিস্তানে অমুসলমান হওয়ার অপরাধে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের হিন্দু, খ্রিস্টান, শিখদের চরম লকডাউন মুহূর্তেও কোনো প্রকার ত্রাণ সামগ্রী দেওয়া হচ্ছে না। সেখানকার এক সমাজসেবী ড. আমজাদ আইয়ুব মির্জা প্রধানমন্ত্রী মোদীর কাছে পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের জন্য ত্রাণসামগ্রী পৌঁছনোর আবেদন জানিয়েছেন। করোনার সংক্রমণের কঠিন সময়ের সুযোগ নিয়ে সেই পাকিস্তান সীমান্তে জঙ্গি অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে। তাছাড়া সোশ্যাল মিডিয়া হোয়াটসআপ, ফেসবুকে ভুয়ো তথ্য পরিবেশন করে ভারতের মুসলমান সমাজকে খেপানোর অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে। 'দ্যা ম্যাসেজ অব ইসলাম', 'দিল্লি মরকজ' নামের দুটি উর্দু ইউটিউব চ্যানেল বিভিন্ন ঘোর সাম্প্রদায়িক মৌলবাদীদের উস্কানিমূলক বক্তব্য আপলোড করা হচ্ছে। পাকিস্তানের হিজবুল চিফ কুখ্যাত সৈয়দ সালাউদ্দিন এক ভিডিয়ো বার্তায় বলছে— পুরো দুনিয়ায় মুসলমানদের উপর জুলুমের কারণেই করোনা ভাইরাসের আবির্ভাব। কিন্তু হায়! সেই পাকিস্তান করোনায় বিপর্যস্ত হয়ে মৃত্যুঞ্জয়ী হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইনের জন্য ভারতের শরণাপন্ন। ভারতের প্রায় প্রত্যেক করোনা সংক্রমণে নিজামুদ্দিনের সংযোগ মিলছে কিন্তু এর পরেও জুম্মাবারে দেশের বিভিন্ন মসজিদে মুসলমানদের জমায়েত ঘটছে। এতে স্বাভাবিকভাবে জনমনে ক্রোধ পুঞ্জিভূত হচ্ছে।

উত্তরপ্রদেশের মুরাদাবাদে স্বাস্থ্যকর্মী ও পুলিশের ওপর বাড়ির ছাদ থেকে মহিলাদের পাথর নিক্ষেপ।

অতিথি কলম

ডা: দেবী শেঠী

করোনা সংক্রমণ থেকে জীবন বাঁচাতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাই মহোষৌধি

ফ্রেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে আমেরিকার বাইয়োজেন নামে একটি জৈব প্রযুক্তি সংস্থা বোস্টনে একটি সমাবেশ করেছিল। সারা বিশ্ব থেকে ১৭৫ জন এই সংক্রান্ত সংস্থার উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের যোগদানের মধ্যে ইতালি থেকেও ২ জন ছিলেন। এক সপ্তাহে কাটার আগেই এদের মধ্যে ৭০ জন করোনা ভাইরাস রোগে আক্রান্ত হন। ম্যাসাচুসেটসে এক ধাক্কায় এত বড়ো সংক্রমণ কখনও দেখা যায়নি। আমার পুত্র প্রসিদ্ধ ম্যাসাচু সেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির প্রধান কার্যালয়ের থেকে ৫ মিনিটের দূরত্বে থেকে পড়াশোনা করে। ম্যাসাচুসটসে সম্পূর্ণ জরুরি অবস্থা জারি হওয়ায় ও সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়ায় সে এখন গৃহবন্দি।

অতীতের মহামারীগুলি থেকে কিন্তু শিক্ষাগ্রহণ জরুরি। ১৯১৮ সালে স্প্যানিশ ফ্লু'র আক্রমণের সময় মার্কিন দেশের সেন্ট লুইস রাজ্যে মৃত্যুর হার ফিলাডেলফিয়ার থেকে অর্ধেক ছিল। এর কারণ দ্বিতীয় রাজ্যটিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমর্থনে বড়ো বড়ো সভা করা হয়েছিল। কিন্তু সেন্ট লুইস সব ধরনের সমাবেশ নিষিদ্ধ করে দেয়। সেখানকার সমস্ত চার্চ সমেত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও বন্ধ ছিল। এই প্রথমেই নেওয়া কড়া পদক্ষেপ হাজার হাজার মানুষের প্রাণ বাঁচানোর সহায়ক হয়।

এ প্রসঙ্গে বলি, আমার দ্বিতীয় পুত্রটি আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে। তার সংখ্যাতত্ত্ব বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করা সহপাঠীরা কিছু পর্যবেক্ষণ করেছে। তাদের মতে সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান, হংকং, থাইল্যান্ড, জাপান প্রভৃতি দেশগুলো চীনের সঙ্গে লেনদেনে যথেষ্ট জড়িত ও নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও করোনার সংক্রমণ সেখানে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ে নি (www.it.ly/2TG9fsi)। এর অন্যতম কারণ এই দেশগুলি ২০০৩ সালে SARS মহামারির আক্রমণ থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল। কত তাড়াতাড়ি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে ভাইরাল ইনফেকসনের ছড়িয়ে পড়া ঠেকানো যায় সেটা খুঁজতেই তারা সোশ্যাল ডিসটেন্সিং বা সামাজিক দূরত্বের তত্ত্ব খুঁজে পায়।

ইতালি, ইরান, ফ্রান্স, জার্মানি বা স্পেন সংক্রমণ আটকাবার ব্যবস্থা নিতে অযথা দেরি করায় তাদের দেশে আক্রান্তের সংখ্যা পূর্ব এশিয়াকে ছাপিয়ে যায়। সৌভাগ্যক্রমে ভারত বিদেশি আগমনের ক্ষেত্রে শুরুতেই প্রতিবন্ধকতা জারি করায় তা অন্য দেশগুলির মনঃপুত না হলেও কিছুটা ফলদায়ী হয়েছে।

হ্যাঁ, মৃত্যুর হার তিন শতাংশকে অধিকাংশ মানুষই অত্যন্ত নগণ্য বলে মনে করছেন। কিন্তু ভারত এক অতি বিশাল দেশ, এখানে করোনার মতো ভয়ানক ছোঁয়াচে রোগের প্রকোপ এই প্রথম মেকাবিলা করতে হচ্ছে। একজন করোনায় সংক্রামিত আরও তিন জনকে সংক্রামিত করতে পারেন যাঁরা আরও ১৪ দিন সংক্রমণের সম্ভাবনা নিয়ে দিন কাটাবেন। এই লেখার সময় ভারতে আক্রান্তের সংখ্যা ১০৭। এর মধ্যে ৫ শতাংশ আইসিইউ-তে ভর্তি হওয়ার যোগ্য এবং ১ শতাংশের ক্ষেত্রে ভেন্টিলেটার সার্পোট ছাড়া শ্বাসপ্রশ্বাস সম্ভব নয়। যে সমস্ত মানুষের শরীরে উচ্চ রক্তচাপ, ক্যান্সার, ডায়াবেটিস রয়েছে বা যাদের বয়স ৭০-এর আশেপাশে বা ঊর্ধ্বে তাঁরা এ রোগের সহজে শিকার হতে পারেন। দেশের অধিকাংশ হাসপাতালেই জরুরি চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার কারণে এই ধরনের শয্যাগুলি ভর্তিই রয়েছে। আমরা কিন্তু ইতিমধ্যেই মহামারীর কবলে পড়ে গেছি। একটা জিনিসই আমরা করতে পারি তাহলো সংক্রমণ ছড়াতে না দেওয়া যাতে আমাদের হাসপাতালগুলিতে নিতান্ত মরণাপন্নকে বাঁচানোর কিছুটা অন্তত স্থান থাকে।

আবার বলছি, এটা ভাবা ভুল যে ভারতের আসন্ন উষ্ণ আবহাওয়া আমাদের পরিত্রাণ করবে কিংবা আমাদের ভাইরাল রোগের ক্ষেত্রে এক ধরনের অন্তর্নিহিত প্রতিষেধক আছে। উলটে যদি আমরা অন্য দেশগুলির মতোই হই, দেখা গেছে প্রত্যেক দেশেই একটি দু'টি সংখ্যা দিয়ে শুরু হয়ে আক্রান্তের বন্যা বয়ে গেছে। ভারতের জনবসতির যে ঘনত্ব সেখানে গোষ্ঠী সংক্রমণ ছড়ালে বিশাল বোমা ফাটার প্রতিক্রিয়া হবে। বহু বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ জার্মান রাজনীতিকঅ্যাঞ্জেলা মারকেল বলেছেন আমাদের মধ্যে২০ থেকে ৬০ শতাংশ আক্রান্ত হবে।

আমাদের কাছে একটিই মাত্র বাঁচার ছোট্ট জানালা খোলা আছে তা হলো সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা যাতে সংক্রমণের সংখ্যা কমানো যায়। অবশ্যই আমরা হয়তো চীনের মতো সম্পূর্ণ লকডাউন বা দেশ বন্ধ করে দেওয়ার মতো ব্যবস্থা নিতে পারব না কিন্তু কয়েকটি

সাধারণ সাবধানতা আমাদের গ্রহণ করতেই হবে।

(১) সমস্ত রকমের যাত্রা সে দেশের মধ্যে হোক বা বিদেশ, ট্রেন হোক বা বাস একেবারেই নিষিদ্ধ করতে হবে। দীর্ঘ পথ কোনো না কোনো যানবাহনে ভ্রমণ এই রোগ সংক্রমণের প্রধান সহায়ক।

(২) একটা ছোটো জায়গার মধ্যে বেশি সংখ্যক লোকের যেখানে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে তা এড়িয়ে চলা। এর মানে স্কুল, ব্যায়ামাগার, মল, খোলা বাজার, পানশালা, থিয়েটার, সিনেমা, মন্দির, অন্যান্য প্রার্থনা স্থল, সাঁতার-পুকুর সবই পড়বে।

(৩) বাড়িতে থেকে কাজ করতে হবে। উপায় নেই অফিস বা কারখানায় একত্রে কাজ করলে অন্যের দ্বারা সংক্রামিত হওয়ায় সম্ভাবনা তো থেকেই যায়।

(৪) নিতান্তই যদি কর্মস্থলে পৌঁছতে হয় তাহলে অন্তত ৬ ফুট দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। ক্যান্টিনে যাওয়ার দরকার নেই। বাইরের যাদের সঙ্গে বৈঠক করার কথা ছিল সেগুলি বাতিল করতে হবে। দশ জনের বেশি এক সঙ্গে থাকার দরকার নেই।

(৫) পূর্ব নির্ধারিত যে কোনো ধরনের সম্মেলন, খেলাধুলোর কর্মসূচি, মেলা, মিছিল, পথসভা, ক্রিকেট ম্যাচ দেখা বাদ দিতে হবে। এগুলি মহামারী ছড়িয়ে দেওয়ার প্রবল সম্ভাবনাময়।

এই সূত্রে আমি কর্ণাটক সরকারকে অবশ্যই ধন্যবাদ জানাবো, তারা সকলের আগে এই পদ্ধতিগুলি সাহস করে নিয়েছে। একই সঙ্গে দেশের অন্য রাজ্যগুলিকেও কর্ণাটককে অনুসরণ করতে বলব। একটি রাজ্য সরকারকে যদি ধরে নিতে হয় মোট জনসংখ্যার ১০ শতাংশ আক্রান্ত হতে পারে, সেখানে ব্যঙ্গালুরুর মতো শহরেই ৫০০০ ক্রিটিক্যাল কেস-এর শয্যা থাকা জরুরি হয়ে পড়বে যার সঙ্গে অক্সিজেনের ব্যবস্থা থাকা তো অপরিহার্য।

এ কথাটাও মাথায় রাখা জরুরি যেহেতু করোনা ভাইরাসের রোগীরা সংক্রমণবাহক, তাই তাদের অন্যান্য রোগীর সঙ্গে সাধারণ হাসাপাতালে চিকিৎসা করানো চলবে না। প্রত্যেক রাজ্য

করোনা ভাইরাসের রোগীরা সংক্রমণবাহক, তাই তাদের অন্যান্য রোগীর সঙ্গে সাধারণ হাসাপাতালে চিকিৎসা করানো চলবে না। প্রত্যেক রাজ্য সরকারেরই উদ্যোগ নেওয়া উচিত কোনো নির্দিষ্ট হাসপাতালকে এই রোগের জন্য চিহ্নিত করা এবং অব্যবহার্য হয়ে পড়ে থাকা পুরনো কোনো হাসপাতালকে সংস্কার করে করোনা রোগীর জন্য অন্তর্বিভাগ ও বহির্বিভাগ চালু করা। যেটি হবে কেবল করোনা হাসপাতাল।

সরকারেরই উদ্যোগ নেওয়া উচিত কোনো নির্দিষ্ট হাসপাতালকে এই রোগের জন্য চিহ্নিত করা এবং অব্যবহার্য হয়ে পড়ে থাকা পুরনো কোনো হাসপাতালকে সংস্কার করে করোনা রোগীর জন্য অন্তর্বিভাগ ও বহির্বিভাগ চালু করা। যেটি হবে কেবল করোনা হাসপাতাল। কর্ণাটকে বহু বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাদের ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য চিকিৎসা সহায়ক যন্ত্রপাতি নিয়ে সরকারকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে। এগুলি করোনা স্পেশালিটি হাসপাতাল বলে লোকে জানছে।

দু' সপ্তাহের স্বল্প সময়ের মধ্যে ইতালিতে দু'শো থেকে দশ হাজার করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। এর প্রধান কারণ প্রাথমিকভাবে আক্রান্ত রোগীরা রোগের উপসর্গ কিছু ধরতেই পারেননি। নির্দ্বিধায় তারা রোগের বীজাণু নিজের থেকে অপরের শরীরে ছড়িয়ে ফেলেছেন। করোনার পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য লক্ষণ ধরা পড়লেই আলাদা করে রাখা। সেই কারণে সরকার অনুমোদিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠিত প্যাথোলজিক্যাল পরীক্ষাকেন্দ্রগুলিতে এখনই বিনামূল্যে পরীক্ষা করার ব্যবস্থা চালু করা দরকার। দক্ষিণ কোরিয়া ও ইতালিতে ঠিক একই সময়ে এই মহামারী শুরু হয়। দক্ষিণ কোরিয়া বস্তুত সমস্ত নাগরিককেই পরীক্ষাধীন করেছিল এবং যাদের শরীরে রোগ লক্ষণ ধরা পড়েছিল তাদের সংস্পর্শে আসা প্রায় সমস্ত মানুষজনের পেছনে ধাওয়া করে তাদের সকলকে আটকে ফেলে। এর নাটকীয় ফল মিলেছিল। হায়! ইতালি এসবের ধার দিয়েও যায়নি, পরিণতি হয়েছে বিধ্বংসী।

আর একটি বিষয়, বিশ্বজুড়ে চিকিৎসা সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত কর্মীদের জন্য প্রতিরক্ষামূলক সাজসরঞ্জামের খুবই অভাব দেখা দিয়েছে। অধিকাংশ দেশ এই সমস্ত সামগ্রীর রপ্তানি ইতিমধ্যেই বন্ধ করেছে। ভারতীয় এন-৯৫ মুখোশ উৎপাদনকারী সংস্থাগুলিকে উপযুক্ত ভরতুকি দিয়ে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উৎপাদন বৃদ্ধি করাতে হবে। চিকিৎসা কর্মীরা অসুস্থ হয়ে পড়লে পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে।

এই সূত্রে যে ৫০ হাজার বিদেশে পাশ করা ডাক্তার ভারতে এসে লাইসেন্সের জন্য অপেক্ষা করছে তাদের অস্থায়ীভাবে অনুমোদন দিয়ে প্রবীণ ডাক্তারবাবুদের অধীনে কাজ করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এরা সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালগুলির কেবলমাত্র ক্রিটিক্যাল কেস ইউনিট এই কাজ করবে। এটা করতে পারলে দু' সপ্তাহের মধ্যেই তারা জাতির এই ব্যধি-বিপর্যয় মোকাবিলায় এক মহামূল্য সম্পদ হয়ে উঠবে।

শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির নির্মাণ, ৩৭০ ধারা বাতিল এবং শরণার্থীদের নাগরিকত্ব প্রদান সশক্ত ভারত নির্মাণের একটি ধাপ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠক ১৫ থেকে ১৭ মার্চ ব্যাঙ্গলুরুতে হওয়ার কথা ছিল। করোনা মহামারীর কারণে তা স্থগিত হয়ে যায়। উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রতি নজর রেখে সঙ্ঘের সরকার্যবাহ ভাইয়া যোশী বলেন, সমস্ত স্বয়ংসেবক নিজ নিজ এলাকায় সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সমস্যা মোকাবিলায় সরকার ও প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলবেন। এই সময় সঙ্ঘের কার্যকরী মণ্ডল শুধুমাত্র তিনটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। পরে সাংবাদিকদের তিনি জানান, বর্তমানে সারা দেশে ৩৯ হাজার স্থানে ৬৩ হাজার নিত্য শাখা, ২৮ হাজার স্থানে মিলন ও মণ্ডলী চলছে। সঙ্ঘের গৃহীত তিনটি প্রস্তাব প্রকাশ করা হলো।

প্রস্তাব-১

শ্রীরামজন্মভূমিতে মন্দির নির্মাণ রাষ্ট্রীয় স্বাভিমানের প্রতীক

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডল মনে করে যে, দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে সমগ্র রাষ্ট্রের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক অযোধ্যায় শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থানে সুরম্য মন্দির নির্মাণের সমস্ত বাধা দূরীভূত হয়েছে। শ্রীরামজন্মভূমি মামলায় ২০১৯ সালের ৯ নভেম্বর দেশের শীর্ষ আদালত যে রায় দিয়েছে তা ভারতে বিচারব্যবস্থার ইতিহাসে সর্বোত্তম রায়গুলির মধ্যে একটি। শুনানির সময় সৃষ্টি করা বহু প্রকার বাধা সত্ত্বেও অপরিসীম ধৈর্য এবং প্রাজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে মাননীয় বিচারপতিগণ একটি অত্যন্ত পরিণত রায় দিয়েছেন। সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডল এই ঐতিহাসিক রায়দানের জন্য দেশের সর্বোচ্চ আদালতকে আন্তরিক অভিনন্দন

জানাচ্ছে। শ্রীরামজন্মভূমির পক্ষে অভিজ্ঞ আইনজীবীরা যে সমর্পণ, নিষ্ঠা ও প্রাজ্ঞতার সঙ্গে প্রামাণ্য তথ্য ও যুক্তি রেখেছেন তার জন্য তাঁরা সবাই অভিনন্দনের যোগ্য। আনন্দের বিষয় যে, সমাজের কোনো অংশই এই রায়কে নিজেদের জয় অথবা পরাজয় হিসেবে না দেখে সমগ্র দেশ, বিচার ব্যবস্থা এবং সংবিধানের জয় হিসেবে স্বীকার করেছে। অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডল সারা দেশের জনগণকে এই পরিণত মানসিকতার জন্য সর্বান্তঃকরণে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

বিশ্বের ইতিহাসে 'শ্রীরামজন্মভূমি মন্দিরের সংঘর্ষ' দীর্ঘকালীন সংঘর্ষগুলির মধ্যে অতুলনীয়। ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে নিরন্তর সংঘর্ষে লক্ষ লক্ষ রামভক্তের বলিদান হয়েছে। এই সংঘর্ষ কখনো কোনো সাধুসন্তের প্রেরণায় হয়েছে, আবার কখনো স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে হয়েছে। শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির ফিরে পাওয়ার জন্য ১৯৫০ সাল থেকে আইনি লড়াই এবং ১৯৮৩ সাল থেকে জনআন্দোলন নিরন্তর চলেছে। বিশ্ব ইতিহাসের এই মহানতম আন্দোলনকে বহু সাধুসন্ত তাঁদের নিরলস পরিশ্রম ও ত্যাগের দ্বারা সফলতার শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছেন। অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডল সেই জ্ঞাত-অজ্ঞাত হুতাত্মাদের পুণ্যস্মরণ ও তঁদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করছে।

সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের পর সমস্ত শ্রেণীর মানুষের বিশ্বাস উৎপন্ন করে সদ্ভাবপূর্ণ রীতিতে তা স্বীকার করানো যেকোনো সরকারের চ্যালেঞ্জের বিষয়। যে ধৈর্য ও সাহসের সঙ্গে সরকার সবার বিশ্বাস উৎপন্ন করেছে তার জন্য কার্যকরী মণ্ডল কেন্দ্র সরকার এবং বর্তমান রাজনৈতিক নেতৃত্বকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছে। সর্বোচ্চ আদালতের রায় এবং রামভক্তদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক 'শ্রীরামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র' নামে এক নতুন ন্যাস গঠন এবং সেই ন্যাসকে সরকার নিয়ন্ত্রিত না করে তাকে সমাজ সঞ্চালিত করা ও প্রশাসনকে সহযোগী ভূমিকায় রাখা সরকারের দূরদর্শিতার পরিচায়ক। যে পুজ্য সাধুসন্তদের আশীর্বাদে এই আন্দোলন চলেছে, তাঁদের নেতৃত্বেই মন্দির নির্মাণের কাজ করার সিদ্ধান্তও প্রশংসনীয়। অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডলের বিশ্বাস যে, এই ন্যাস শ্রীরামজন্মভূমির ওপর সুরম্য মন্দির এবং তৎসংলগ্ন এলাকার নির্মাণকাজ শীঘ্রাতিশীঘ্র সম্পন্ন করবে। এই পবিত্র কাজে সমস্ত ভারতীয় এবং সমগ্র বিশ্বের রামভক্তরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন।

এটা নিশ্চিত যে, এই পবিত্র মন্দিরের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে মর্যাদা, সহমর্মিতা, একাত্মভাব এবং মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামের জীবনাদর্শের অনুরূপ জীবন নির্মাণের ভাব বৃদ্ধি হবে এবং ভারত সারা বিশ্বে শান্তি, সদ্ভাব ও সমন্বয় স্থাপন করার দায়িত্ব পূর্ণ করতে পারবে।

প্রস্তাব-২

জম্মু-কাশ্মীরে ভারতের সংবিধান পূর্ণরূপে প্রয়োগ এবং রাজ্য পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত এক অভিনন্দনযোগ্য পদক্ষেপ

মহামহিম রাষ্ট্রপতির আদেশে ভারতীয় সংবিধানকে জম্মু-কাশ্মীরে পূর্ণরূপে প্রয়োগ করার এবং সংসদের দুই কক্ষেই অনুমোদনের পর ৩৭০ধারাকে বাতিল করার সিদ্ধান্তকে সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডল আন্তরিক ভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছে। জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখকে দুটি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পুনর্গঠিত করার সিদ্ধান্তও এক প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডল এই সাহসী ও ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের জন্য কেন্দ্র সরকার ও রাষ্ট্রহিতে পরিপূর্ণ সমস্ত রাজনৈতিক দলকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। সম্মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সঙ্গীদের এবিষয়ে পরিলক্ষিত ইচ্ছাশক্তি ও দূরদর্শিতাও প্রশংসনীয়।

ভারতীয় সংবিধানের সমস্ত ধারা দেশের সমস্ত এলাকায় সমান ভাবে প্রয়োগ হওয়ার কথা, তথাপি দেশ বিভাজনের অব্যবহিত পরে পাকিস্তানি আক্রমণের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ৩৭০ ধারাকে এক অস্থায়ী ব্যবস্থা রূপে সংবিধানে যুক্ত করা হয়েছিল। পরে ৩৭০ ধারার আড়ালে জম্মু-কাশ্মীরে বহু অনুচ্ছেদ শুধু যুক্ত করাই হয়নি, তৎকালীন রাষ্ট্রপতির আদেশে ৩৫এ-র মতো অনুচ্ছেদকে সংবিধানে যুক্ত করে বিচ্ছিন্নতার বীজ বপন করা হয়েছে। এই সাংবিধানিক অসঙ্গতির কারণে অনুসূচিত জাতি, জনজাতি, অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণী, গোরখা সমাজ, মহিলা, সাফাই কর্মচারী এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত শরণার্থীরা ঘোর ভেদভাবের শিকার হয়েছে। জম্মু ও লাদাখকে রাজ্য বিধানসভায় আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব, সম্পদের বণ্টন ও নির্ণয় প্রক্রিয়ায় সমুচিত প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল।

এই সমস্ত ভুল নীতির কারণে আমরা দেখেছি যে, রাজ্যের সর্বত্র মৌলবাদ ও সন্ত্রসবাদের ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষার মানসিকতা মাথা চাড়া দিয়েছে।

অখিলভারতীয় কার্যকরী মণ্ডলের নিশ্চিত ধারণা যে, সম্প্রতি গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং তার ক্রিয়ান্বয়নের ফলে সেইসব সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক অসঙ্গতি দূর হয়ে যাবে। কার্যকরী মণ্ডল এও বিশ্বাস করে যে, সেইসব সিদ্ধান্ত ভারতের মৌলিক ধারণা ' এক রাষ্ট্র এক জাতি'র অনুরূপ এবং সংবিধানের

প্রস্তাবনায় বর্ণিত 'আমরা ভারতের নাগরিক' আকাঙ্ক্ষাকে পুষ্টকারী পদক্ষেপ।

অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডলের এটাও ধারণা যে, রাজ্য পুনর্গঠনের সঙ্গে সঙ্গে ওই তিনটি ক্ষেত্রে বসবাসকারী সমস্ত শ্রেণীর সামাজিক ও আর্থিক বিকাশের নতুন দিগন্ত তৈরি হয়েছে। রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে লাদাখ ক্ষেত্রের মানুষের দীর্ঘকালের চাহিদার পূর্তি হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের সমগ্র বিকাশের রাস্তাও প্রশস্ত হয়ে গিয়েছে। অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডল আশা করে যে, উদ্বাস্তু ও শরণার্থীদের চাহিদাও শীঘ্র পূরণ হয়ে যাবে। সেইসঙ্গে কাশ্মীর উপত্যকার উদ্বাস্তু হিন্দু সমাজের সুরক্ষা এবং সম্মানজনক পুনর্বাসনের প্রক্রিয়াও শীঘ্রাতিশীঘ্র শুরু করা প্রয়োজন।

এটি ঐতিহাসিক তথ্য যে, মহারাজা হরি সিংহ 'বিলয়পত্রে' স্বাক্ষর করে রাজ্যকে সম্পূর্ণরূপে ভারতে বিলয় করে দিয়েছেন, ৩৭০ ধারার দুরুপোযোগে উৎপন্ন সমস্যাগুলি দূর করে রাষ্ট্রীয় একাত্মতা, সংবিধান ও জাতীয় পতাকার সম্মান রক্ষার জন্য ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ও পণ্ডিত প্রেমনাথ ডোগরার নেতৃত্বে প্রজা পরিষদ আন্দোলনের সহযোগীরা এবং অবশিষ্ট ভারতের দেশভক্ত সমাজ সংঘর্ষ করেছে। গত ৭০ বছর ধরে রাজ্যের রাষ্ট্রীয় শক্তি বাকি ভারতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সন্ত্রসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই জারি রেখেছে। তাদের মধ্যে অনেকে প্রাণ বলিদান দিয়েছেন। সেনা ও সুরক্ষাবহিনীর কয়েক হাজার জওয়ান দেশের একতা ও সার্বভৌম রক্ষার জন্য শৌর্য-বীর্যের পরিচয় দিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে জীবনও বলিদান দিয়েছে। অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডল এদের সবার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছে।

অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডল দেশবাসীকে আহ্বান করছে যে, মর্যাদা ও মূল ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য রাজনৈতিক মতভেদের ঊর্ধ্বে উঠুন এবং জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখের বিকাশ প্রক্রিয়ায় সহযোগী হয়ে রাষ্ট্রের একতা ও অখণ্ডতাকে পুষ্ট করুন। অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডল সরকারকেও আহ্বান করছে যে, এই ক্ষেত্রের নাগরিকদের সমস্ত আশঙ্কা দূর করে লাভপ্রদ, ন্যায়সঙ্গত শাসন ব্যবস্থা এবং আর্থিক বিকাশের দ্বারা তাঁদের আকাঙ্ক্ষার পূর্তি করুন।

প্রস্তাব-৩

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন-২০১৯ ভারতের নৈতিক ও সাংবিধানিক দায়িত্ব

সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডল ভারতের প্রতিবেশী ইসলামি দেশ পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানে ধর্মীয় অত্যাচারের শিকার হয়ে ভারতে আসা হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, পারসি ও ক্রিস্টানদের ভারতের নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রক্রিয়ার জটিলতা সমাপ্ত করে তার সরলীকরণের জন্য নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন-২০১৯ প্রণয়ন করার জন্য সংসদের উভয় কক্ষ এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত বিভাজন ধর্মের ভিত্তিতে হয়েছে। দুই দেশই তাদের নিজেদের ভূখণ্ডে সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা, পূর্ণ সম্মান এবং সমান সুযোগসুবিধা ভোগের আশ্বাস দিয়েছিল। ভারতের সরকার ও সমাজ উভয়েই সংখ্যালঘুদের হিতার্থে এবং তাদের বিকাশের লক্ষ্যে সাংবিধানিক দায়িত্ব-সহ নানাবিধ আইন ও নীতি প্রণয়ন করে। অন্যদিকে, ভারত থেকে আলাদা হওয়া দেশ নেহরু-লিয়াকত চুক্তি এবং সময়ে সময়ে নেতাদের আশ্বাস সত্ত্বেও সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার পরিবেশ দিতে পারেনি। ওই দেশগুলিতে বসবাসকারী সংখ্যালঘুদের ওপর ধর্মীয় উৎপীড়ন, তাদের সম্পত্তি জবরদখল এবং মহিলাদের ওপর নিত্যনৈমিত্তিক অত্যাচারের ঘটনা তাদের নতুন এক দাসত্বের দিকে ঠেলে দিয়েছে। ওখানকার সরকারও অন্যায় আইন ও বিভেদ সৃষ্টিকারী নীতি প্রণয়ন করে ওই সংখ্যালঘুদের ওপর উৎপীড়ন আরও বাড়িয়েই দিয়েছে। ফলস্বরূপ, বিশাল সংখ্যায় সংখ্যালঘুরা ওই দেশগুলি থেকে পালিয়ে এসে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। দেশভাগের পরে ওই দেশগুলিতে সংখ্যালঘুদের জনসংখ্যার দ্রুত হ্রাস এই তথ্যের সত্যত্য প্রমাণ করেছে।

এটা মনে রাখতে হবে যে, ভারতীয় সংস্কৃতির সংরক্ষণ, সংবর্ধন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে ওখানে বসবাসকারী ভারতীয় সমাজেরও গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা ছিল। এই কারণে ভারতীয় সমাজ ও ভারত সরকারের নৈতিক ও সাংবিধানিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে এই অত্যাচারিত সংখ্যালঘুদের ভারতের নাগরিকত্ব প্রদান করার। গত ৭০ বছর ধরে এই বন্ধুদের জন্য সংসদে বহুবার চর্চা হয়েছে এবং কেন্দ্রের বিভিন্ন সরকারের পক্ষ থেকে সময়ে সময়ে অনেক ব্যবস্থার কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু প্রক্রিয়ার জটিলতায় বহু সংখ্যক মানুষ আজও নাগরিকত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে অনিশ্চয়তা ও ভয়ের পরিবেশের মধ্যে বেঁচে রয়েছে। বর্তমান সংশোধনী আইনের বলে এই সমস্ত মানুষ সম্মানজনক ভাবে বাঁচতে পারবেন।

সংসদে চর্চার সময় এবং পরে সময়ে সময়ে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, এই আইনের বলে ভারতের একজন নাগরিকও প্রভাবিত হবেন না। কার্যকরী মণ্ডল সন্তোষ প্রকাশ করছে যে, এই আইন প্রণয়ন করার সময় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের আশঙ্কাকে দূর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এই আইন ওই তিন দেশ থেকে ধর্মীয় ভাবে অত্যাচারিত হয়ে ভারতে আসা দুর্ভাগা মানুষদের নাগরিকত্ব দেবার জন্য এবং কোনো ভাবেই কারো নাগরিকত্ব কেড়ে নেবার জন্য নয়। কিন্তু জিহাদি-বামপন্থী জোট, কিছু বিদেশি শক্তি কয়েকটি স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক দলের সমর্থনে সমাজের একটি অংশে কাল্পনিক ভয় ও বিভ্রান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করে দেশে হিংসা ও অরাজকতা সৃষ্টির কুৎসিত প্রয়াস করে চলেছে।

অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডল এই সব কাজকর্মকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করছে এবং সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে দেশের সামাজিক সৌহার্দ্য ও রাষ্ট্রীয় একাত্মতা নষ্টকারী শক্তির যোগ্য তদন্ত করে সমুচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করার। অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডল সমাজের সমস্ত শ্রেণী বিশেষ করে সচেতন ও দায়িত্বশীল নেতৃত্বের প্রতি আবেদন জানাচ্ছে যে, এবিষয়ে সত্যাসত্য উপলব্ধি করুন এবং সমাজে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ অটুট রাখতে ও দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র বিফল করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করুন। ■

করোনা মহামারীতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সেবাকাজ

দেশের বিপদের দিনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের দেশ ও জাতির সেবায় অগ্রণী ভূমিকার কথা সর্বজনবিদিত। করোনা মহামারীর ভয়াবহ আবহে সারা দেশের স্বয়ংসেবকরা সরকারি স্বাস্থ্যবিধি পালন করে যথারীতি বিভিন্ন রকম সেবাকাজ করে চলেছেন। সিকিম, উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের

১৩ হাজার ৮৯৮ জন স্বয়ংসেবক ২০ এপ্রিল পর্যন্ত ৪ হাজার ৪৫৫ স্থানে ১ লক্ষ ৪৫ হাজার ৬৯৪ পরিবারের হাতে চাল, ডাল, আলু ও শুকনো খাবার পৌঁছে দিয়েছেন। ৪৯ হাজার ৩২৫ জনতে মাস্ক ও স্যানিটাইজার বিতরণ করেছেন।

এর সঙ্গে জনসচেতনতা মূলক অভিযান, রক্তদান, প্রতিটি জেলায় সহায়তা কেন্দ্র, চিকিৎসকের টিম গঠন, সাফাইকর্মী, পুলিশ ও স্বাস্থ্যকর্মীদের বিভিন্ন ভাবে সহায়তা করা হয়। বস্তি এলাকায় স্বয়ংসেবকরা বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দেন। অন্যান্য রাজ্যে আটকে পড়া মানুষদের সেই সেই রাজ্যের পক্ষ থেকে সহায়তা দানের ব্যবস্থা করা হয়।

বিশেষ নিবন্ধ

পালঘর ও বিজনসেতুর সন্ন্যাসী হত্যার ধরনে কী অদ্ভুত মিল!

দেবতনু ভট্টাচার্য

সংখ্যাতত্ত্ব অনুযায়ী যে দেশে শতকরা ৮০ জন হিন্দু, সেই সনাতনী ভারতে গণপিটুনিতে গেরুয়া বসনধারী সন্ন্যাসী হত্যা! তাও পুলিশের সামনে! এলাকার জনচরিত্র দেখে অনেকের ধারণা হয়েছে এই ঘটনার পিছনে খ্রিস্টানদের হাত আছে। এলাকার রাজনৈতিক বিন্যাস দেখে অনেকে এই ঘটনার পিছনে কমিউনিস্টদের যোগসূত্র খুঁজছেন। অনেকে আবার বলছেন, যেখানে ঘটনাটি ঘটেছে সেই গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপির দখলে। কিন্তু এখনও সত্য অপ্রকাশিত। এখানে বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়, ঘটনা ঘটলো ১৬ এপ্রিল রাত ১১-৩০ মিনিট নাগাদ। থানায় জেনারেল ডায়েরি হলো ১৭ এপ্রিল রাত ১০-৫৮ মিনিটে! এফআইআর হলো ১৮ এপ্রিল। তিনদিন পরে সেই ঘটনার মিডিয়া কভারেজ শুরু! ঘটনার পাঁচদিন পরে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বয়ান এলো! এখানে কয়েকটা তথ্য তুলে ধরার চেষ্টা করবো যেগুলো থেকে কয়েকটা সম্ভাবনা সকলের সামনে হয়তো স্পষ্ট হবে।

সুশীলগিরি মহারাজ ও কল্পবৃক্ষ গিরি মহারাজ।

প্রথমত, দেখা যাক ঘটনাটা ঠিক কী ঘটেছিল সেইরাতে। ৭০ বছরের মহন্ত কল্পবৃক্ষ গিরি এবং ৩৫ বছরের সুশীলগিরি মহারাজ নামের দুই সন্ন্যাসী কাণ্ডিভালির এক আশ্রমে থাকতেন। তাঁরা সুরাটে এক অন্ত্যেষ্টিতে যোগ দেবেন বলে সেখানে যাবার মনস্থ করেন। দুজনে নীলেশ ইয়ালগাডে (৩০) নামের একজন গাড়িচালকের কাছ থেকে গাড়ি ভাড়া করে কাণ্ডিভালি থেকে সুরাটের উদ্দেশে রওনা দেন। রাস্তায় যাতে আটকে পড়তে না হয় তার জন্য তাঁরা মুম্বই-গুজরাট হাইওয়ের বদলে পালঘর জেলার পিছন দিকের রাস্তা নেন। গড়চিঞ্চলে গ্রামের কাছে বনবিভাগের পাহারাদার তাঁদের রাস্তা আটকায়। তাঁরা যখন পাহারাদারের সঙ্গে কথা বলছিলেন সেই সময়ে একটি দল তাঁদের উপর হামলা করে। গত কয়েকদিন ধরে স্থানীয় গ্রামবাসীরা নজরদার বাহিনী তৈরি করেছিলেন। সেখানে গুজব রটেছিল মানবদেহের অংশ পাচারকারী ও ছেলেধরারা রাতে ওই এলাকায় সক্রিয় হয়। এর আগে ডক্টর বিশ্বাস ভালভি ও তাঁর দল বনবাসী অধ্যুষিত সারণি গ্রামে জিনিসপত্র পৌঁছে দিতে যাবার সময়ে হামলার মুখে পড়েন। তাঁদের উদ্ধার করতে যাওয়া পুলিশবাহিনীর উপর পাথর ছোঁড়া হয়। এ ঘটনা ঘটে কাসা থানার এলাকায়, যেখানে এই গণপিটুনির ঘটনা ঘটেছে। দিন দশেক আগে দাদরা ও নগর হাভেলি যাবার সময়ে এক অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে এক পুলিশ বাহিনীও স্থানীয় মানুষের হামলার মুখে পড়েছিল এই এলাকায়। দেখা যাচ্ছে গুজব রটিয়ে গণপিটুনির একটা ক্ষেত্র আগে থেকেই প্রস্তুত করা হয়েছিল। সাধারণত কোনও এলাকাকে স্থানীয় প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে একটা মুক্তাঞ্চল হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এই ধরনের গুজব ছড়ানোর চেষ্টা করা হয়। প্রশ্ন হলো, কারা এই এলাকাকে মুক্তাঞ্চলে পরিণত করতে চাইছে? কেনই বা চাইছে?

আসুন, এলাকা সম্পর্কে আরও কয়েকটি তথ্য নিয়ে আলোচনা করি। পরিসংখ্যান বলছে বেশ ভালো সংখ্যায় মিশনারি চার্চ এখানে সক্রিয় আছে। খ্রিস্টান মিশনারিদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকা কাস্টকারী নামক একটি এনজিও-র প্রধান সিরাজ বালসারা নামে এক মহিলা গ্রেপ্তার হওয়া অভিযুক্তদের আইনি সহায়তা দিচ্ছেন। এই সিরাজ বালসারার স্বামী প্রদীপ দেশভক্ত প্রভুর নাম ছিল পিটার ডি মিলো। তিনি ছিলেন একজন খ্রিস্টান পাদরি। পরে তিনি নাম পরিবর্তন করেন। আরও খবর, অভিযুক্তদের আইনজীবীও পালঘরের চার্চের সঙ্গে সম্পর্কিত। পালঘর জেলা হলো উত্তর পশ্চিম মহারাষ্ট্রের একটি জেলা যা দক্ষিণ গুজরাটের সুরাটের পাশের জেলা। মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের এই পুরো এলাকাটা বনবাসী অধ্যুষিত এলাকা এবং এই এলাকায় বহুদিন ধরেই খ্রিস্টান মিশনারি ও চার্চ গুলি ধর্মান্তরকরণের কাজে লেগে আছে। স্বামী অসীমানন্দজী গ্রেপ্তার হওয়ার পর ওই এলাকায় খ্রিস্টান মিশনারিরা কার্যত বিনা বাধায় তাদের ধর্মান্তরকরণের কাজ চালাতে থাকে। পরিণামে রাজনৈতিক বিন্যাসেরও পরিবর্তন হতে থাকে এলাকায়। মোটের উপর ভিডিয়ো দেখে যা বোঝা গেছে তা হলো এই মব লিংচিঙের পিছনে একটা বড়ো মোটিভ ছিল প্রচণ্ড রকমের গেরুয়া বিদ্বেষ।

পাশাপাশি এই অভিযোগও উঠেছে যে ,স্থানীয় সিপিএম বিধানসভা সদস্য কমরেড বিনোদ নিকোলাই এই ঘটনার পেছনের আসল মাথা। প্রসঙ্গত, এখানে ২০১৪-র নির্বাচন বাদ দিলে প্রায় দু'দশক ধরে স্থানীয় বিধানসভাটি সিপিএমের দখলে। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড খ্রিস্টান মিশনারি এবং এদের মতদাতা সোনিয়া গ্যাং, কমিউনিস্ট এবং অতিবাম গোষ্ঠীর সম্মিলিত ষড়যন্ত্রে সৃষ্টি হওয়া চূড়ান্ত হিন্দু বিদ্বেষেরই পরিণাম।

সন্ন্যাসীদের পিটিয়ে মারার প্রসঙ্গে ১৯৮২ সালের ৩০ এপ্রিল কলকাতার বিজন সেতুর সেই কুখ্যাত ঘটনার উল্লেখ না করলেই নয়। সেদিন আনন্দমার্গের ১৬ জন সন্ন্যাসী এবং একজন সন্ন্যাসিনীকে একইরকম ভাবে পিটিয়ে হত্যা করেছিল পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্টরা। আধমরা দেহগুলোকে পেট্রল দিয়ে জ্বালিয়ে দিতেও এদের হাত কেঁপে ওঠেনি সেদিন। পালঘরের সন্ন্যাসী হত্যার ধরনও সেই একই রকম। কী অদ্ভুত মিল দুটো ঘটনার মধ্যে! একই রকম 'ছেলেধরা' গুজব ছড়িয়ে দেওয়া, একইরকম গেরুয়া বিদ্বেষের মোটিভ। এখানেও তখন সিপিএমের এমএলএ। নাম শচিন সেন। ওখানেও এখন সিপিএমের এমএলএ। নাম বিনোদ নিকোলাই। তবে বিজন সেতুকাণ্ডে একজনও গ্রেপ্তার হয়নি আজ পর্যন্ত, যেখানে পালঘর কেসে ১১০ জনকে কমপক্ষে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বিজন সেতুতে সন্ন্যাসীদের হত্যার বিরোধিতায় সেদিন রাস্তায় নেমেছিলেন এই বঙ্গের বুদ্ধিজীবীরা, যেটা পালঘরের ক্ষেত্রে দেখা গেল না। হয়তো তখনও বুদ্ধিজীবীদের মেরুদণ্ড কিছুটা হলেও অবশিষ্ট ছিল যেটা আজ সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয়েছে।

আশার কথা, সনাতনী ভারতীয় সমাজ মেরুদণ্ডহীন হয়ে যায়নি। প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। লকডাউন না থাকলে হয়তো এই প্রতিবাদের ঢেউ সুনামি হয়ে আছড়ে পড়তো রাজপথে।

(লেখক হিন্দু সংহতির সভাপতি)

চিঠিপত্র

পশ্চিমবঙ্গ এখন সব বিষয়ে অন্য রাজ্যের ওপর নির্ভরশীল

একটা সময় ছিল যখন সমগ্র বঙ্গভূমি সারা ভারতে সব বিষয়ে অর্থাৎ শিক্ষা, শিল্প, চিকিৎসা, কর্মসংস্থান ইত্যাদিতে প্রথম স্থানাধিকারী ছিল। ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ, নোবেল পুরস্কারজয়ী বিজ্ঞানী সিভি বেঙ্কট রমন কলকাতা থেকেই পড়াশোনা করেছিলেন। সুচিকিৎসার জন্যবিভিন্ন রাজ্যের রোগীরা কলকাতাতেই আসতেন। দেশভাগের পর ড. বিধান চন্দ্র রায়ের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীত্বকালেও পশ্চিমবঙ্গ শিল্পে ভারতের মধ্যে প্রথম স্থানে এবং শিক্ষায় দ্বিতীয় স্থানে ছিল। কর্মসংস্থানের জন্য ভিন্ন প্রদেশ থেকে লোকজন কলকাতাতেই আসতেন। বর্তমানে অবস্থাটা সম্পূর্ণ পালটে গেছে। উচ্চ শিক্ষার জন্য পশ্চিমবঙ্গবাসী এখন অন্য রাজ্যে যাচ্ছে। সুচিকিৎসা পেতে পশ্চিমবঙ্গবাসী এখন ভেলোর, চেন্নাই, ব্যাঙ্গালোর, হায়দরাবাদ প্রভৃতি স্থানে ছুটছে। কর্মসংস্থানের ব্যাপারেও সেই একই ছবি। পশ্চিমবঙ্গবাসী বেকাররা এখন অন্য রাজ্যে ছুটছে কর্মসংস্থানের জন্য। কারণ ৩৪ বছরে কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। এক সময় ভারতের শেফিল্ড নামে খ্যাত শিল্পাঞ্চল এখন শিল্পের শ্মশানে পরিণত হয়েছে। আসানসোল দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল যা এক সময় ভারতের রূঢ় অঞ্চল নামে খ্যাত ছিল বর্তমানে ধুঁকছে। জিটি রোড আর বিটি রোডের দু'ধারের শিল্পগুলি মৃত্যুশয্যায় শায়িত। হুগলী নদীর দু'ধারের জুটমিলগুলি একে একে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং ওষুধ কোনও কিছুই আর পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন হয় না। এ সব কিছুর জন্যই এখন পশ্চিমবঙ্গ ভিন্ন রাজ্যের ওপর নির্ভরশীল। যে বঙ্গদেশ এক সময় সমগ্র ভারতের পথ প্রদর্শক ছিল তার বর্তমান অবস্থা কী করুণ!

—শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,
ডেজিরে কমপ্লেক্স, বড়বাজার,
চন্দননগর।

করোনা মোকাবিলায় বিজ্ঞানমনস্ক হওয়া প্রয়োজন

করোনার তাণ্ডবে সারা বিশ্ব আতঙ্কিত। এর করাল গ্রাসে মানবজীবন ভয়ানক বিপদগ্রস্ত। তবে নিরাশা হওয়ার কারণ নেই, কারণ বিজ্ঞান কখনও হার মানে না। এই মারণ ব্যাধিকে বিজ্ঞানের কাছে পরাস্ত হতেই হবে। সেটাই আমাদের সব থেকে বড়ো মনোবল। তবে এতেই নিশ্চিন্ত থাকলে শুধু হবে না, প্রত্যেককেই সচেতন ভাবে স্বাস্থ্যবিধি অবশ্যই মানতে হবে। ডাক্তার, নার্স বিজ্ঞানমনস্ক বিশিষ্টজনের পরামর্শ মেনে চলা ও প্রশাসনের নির্দেশ মানলে সংক্রমণ ৯০ ভাগ কমে যাবে, বাকিটা চিকিৎসা বিজ্ঞানের দ্বারা প্রতিরোধ ও নির্মূল করা সহজ হবে।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বর্তমান ভূমিকা প্রশংসনীয়। তাই অন্যান্য উন্নত (শিক্ষা ও বিজ্ঞানে) দেশগুলির মতো এদেশে সেভাবে সংক্রামিত হয়নি। কিন্তু সেই ভেবে আত্মতুষ্টির কোনো স্থান নেই। একটু ভুল হলে অনেক জীবনহানি ঘটবে। তাই এর বিরুদ্ধে লড়াই জারি রাখতে হবে। সভা, সমাবেশ ও জমায়েত অনুষ্ঠান হোলির আগে থেকেই বিধিনিষেধ ছিল। তা সত্ত্বেও ১২ মার্চ দিল্লিতে তবলিগি জামাতের বিশাল জমায়েত কীভাবে সংগঠিত হলো। প্রশাসন কেন আটকালো না? শাহিনবাগের আন্দোলনে মদতকারী কুবুদ্ধিজীবীদের সমালোচনা ও ধর্মীয় হস্তক্ষেপের অশান্তিও অরাজগতার ভয়ে! কিন্তু এর ফল কী হলো। এদেশে এ রোগে মোট আক্রান্তের মধ্যে ৩০ ভাগই এই হঠকারী নিজামুদ্দিন সমাবেশের কারণ। এই নির্বুদ্ধিতা ও গোঁয়ার্তুমির ফল সকলকেই ভুগতে হচ্ছে। এটা মনে রাখতে হবে, অপরাধ, অস্বাস্থ্য, অসামাজিকতা, অসংযমী আচরণ ও অসৎ কর্মের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করতেই হবে। এক্ষেত্রে প্রশাসন দুর্বলতা দেখালে তার ফল জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকেই ভুগতে হবে। মনে রাখা দরকার, প্রকৃত ধর্ম মানবতাকেই বেশি গুরুত্ব দেয়। যিশু, বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, রামকৃষ্ণ, স্বামীজী তাই বলেছেন। তাঁদের কর্মধারায় মানবিক গুণের বিকাশ ঘটেছে। কেউই বিজ্ঞানের বিরোধিতা বা অস্বীকার করেনি। অথচ এখনও আমরা অনেকে অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবে আছি। মিথ্যা ফতোয়া জারি করে দেশে অশান্তি সৃষ্টি করলে মানব সমাজের কোনো কল্যাণ ঘটে না। জ্ঞানের আলোকেই মানব সমাজের কল্যাণ ও বিকাশ ঘটে।

—সঞ্চয় দত্ত,
নবাবপুর, হুগলী।

কোচবিহার পুরপ্রশাসক বিষয়টি দেখুন

সম্প্রতি করোনার ভয়াবহতা সর্ববিশ্বকে গ্রাস করেছে। আমরা এখন পরিচ্ছন্ন থাকার চেষ্টা করছি। তবুও কিছু অংশের মানুষ বেমালুম ভুলে ঘরের নোংরাগুলি নর্দমায় নিক্ষেপ করে পরিবেশ নোংরা করছেন। যার দরুন ডেঙ্গু ও চিকনগুনিয়ার মতো রোগও একদিন মহামারী আকার ধারণ করবে। তখন হয়তো সচেতন হবেন বৈকি! প্রধানমন্ত্রী আজ থেকে চার-পাঁচ বছর আগে 'এক ধাপ স্বচ্ছতা কি ওর' প্রকল্প শুরু করেছিলেন। আমাদের রাজ্য তার বিশেষ কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। আজ দেখছি করোনার ভয়ে সকলেই মুখে মাস্ক পরছেন ও সেনেটাইজার ব্যবহার শুরু করেছেন।

কোচবিহার শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত রাজবাড়ি আবাসন। এই আবাসন ১৯নং ওয়ার্ডে অবস্থিত। দু'বছর আগের এবড়োখেবড়ো খানাখন্দে ভরা রাজবাড়ি হাউজিং রোডের কথা মনে পড়লে গা শিউরে ওঠে। সমস্যার কথা কোনো একটি

দৈনিকে লেখালেখি শুরু হলে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীর নজরে আসে। তারপর তিনি রাস্তাটি পাকা এবং এলইডি আলোর ব্যবস্থা করে দেন। এই জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীকে জানাই অভিনন্দন।

যাই হোক, এখন সমস্যা হলো হাউজিং রোডের একধারে আবাসনের দেয়াল ঘেষে কনক্রিটের পাকা নর্দমাটি চূড়ান্ত নোংরা ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে রয়েছে। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর নোংরা আবর্জনা পরিষ্কারের না করায় নর্দমা তার গতিপথ হারিয়েছে। পাশাপাশি বদ্ধ জমা জলে ডেঙ্গু মশার চাষ হচ্ছে। কারণটি হলো হাউজিং রোডের দোকানগুলির সমস্ত নোংরা এই নর্দমাটিতে নিয়মিত জমা হয়। পরিষ্কারের চিন্তা ভাবনা--- না আছে ওয়ার্ড কাউন্সিলরের, না আছে পৌরপ্রধানের আর না আছে রাজবাড়ি আবাসনের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের। একে অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাতে ব্যস্ত। ১নং মান্টু দাস পল্লী লাগোয়া ১৯নং কালী মন্দির থেকে ভবানী হল, তৎসহ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা পর্যন্ত নর্দমার নোংরা উপচে রাস্তার উপরে উঠে আসছে অর্থাৎ এক কথায় বেহালদশা। কী আশ্চর্য, কারোরই যেন হেলদোল নেই! আসলে দোষটা আমাদেরই। জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের সময় গালভরা প্রতিশ্রুতি শুনে আমাদের মনটা গলে যায়। কিন্তু ভোটে জিতে তাঁরা এমুখো হন না। তারপর প্রায় পাঁচ বছর আমরা তিলে তিলে নানান রোগ ব্যধিতে শেষ হতে থাকি। আবাসনের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দেখেও না দেখার ভান করেন। গ্রাউন্ডফ্লোরের ঘরগুলি চিরকাল স্যাঁতসেতে এবং নালা চিরকালই আবাসিকের ব্যবহৃত নোংরা জমা জলে বদ্ধ। এই কারণে নতুন কোনো আবাসিক এলে গ্রাউন্ডফ্লোর কয়েকদিন বাদে ছেড়ে দেন। এতে পৌরপ্রশাসন অনেক আর্থিক ক্ষতির শিকার হয়। পাশাপাশি নিরাপত্তারও অভাব রয়েছে। কদিনের জন্য কোনো আবাসিক ছুটিতে গেলে চুরি অবধারিত। আবাসনের মাঠের একপাশে রাজবাড়ি উদ্যানের একটি গাছ দীর্ঘদিন ধরে দেয়াল ভেঙে পড়ে রয়েছে, সারাবার বা সরাবার পৌর দপ্তরের কোনো উদ্যোগ নেই। ভ্যাট নিয়মিত পরিষ্কার হয় না আর আবাসনের ভিতরে পৌর পানীয় জলের কোনো লাইন নেই। আমরা পাশের অন্য ওয়ার্ড থেকে পানীয় জল এনে থাকি। পৌরকরও বকেয়া নেই। তবুও কেন নিশ্চুপ প্রশাসন।

অতএব, আবাসনের আবাসিক-সহ এতদঅঞ্চলের সমস্ত নাগরিক পৌর সুবিধা থেকে কেন বঞ্চিত? আগামী পৌরসভা নির্বাচনে এর প্রভাব পড়বেই। তাই, করজোড়ে মিনতি করছি বিষয়টি অবশ্যই দেখুন পৌরপ্রশাসক।

—রাজু সরখেল,
দিনহাটা, কোচবিহার।

আর্যরা বহিরাগত তত্ত্বটি ভুল

অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মতে এশিয়া মহাদেশের বর্তমান কাজাকিস্তান ও উজবেকিস্তানে অবস্থিত তৃণভূমি অঞ্চল ছিল আর্যদের আদি বাসভূমি। আবার ইউরাল নদী ছিল ইউরোপ ও এশিয়ার সীমা নির্ধারক নদী। ইউরাল নদীর পূর্বে রয়েছে আরল সাগর। ইউরাল- আরল অঞ্চল থেকে গৌরবর্ণ মানুষদের দল বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পথে সপ্তসিন্ধুতে আসেন। কোন পথে এরা এসেছিলেন তা বিচার করা যাক।

উল্লেখ্য, আজকের আমুদরিয়া নদীর পুরাণ বর্ণিত নাম হচ্ছে 'চক্ষু' নদী। উচ্চারণ ভেদে অক্ষু বা অক্সাস। আরবি-ফারসি প্রভাবে আমুদরিয়া। এই নদীর উৎসস্থল হচ্ছে পামির গ্রন্থিস্থল অর্থাৎ পুরাণে বর্ণিত মেরু পর্বত। এই নদী অধুনা তাজিকিস্তান, আফগানিস্তানের উত্তর সীমানা, তুর্কমেনিস্তান হয়ে উজবেকিস্তানে প্রবেশ করে আরল সাগরে মিশেছে। অর্থাৎ চক্ষু বা আমুদরিয়ার মোহনা হচ্ছে আরল সাগরের দক্ষিণ অংশ। এই মোহনা থেকে গৌরবর্ণের মানুষেরা চক্ষু নদীতট বরাবর আফগানিস্তানের সীমান্ত ও গিরিপথ ধরে হিন্দুকুশ পর্বত পার করে কুম্ভা বা কাবুল নদীতটে আসে। কাবুল নদীতট ধরে সিন্ধুনদ তটে পৌঁছায়। অর্থাৎ সপ্তসিন্ধুতে আসে। উল্লেখ্য, তখন ভারত নামকরণ হয়নি।

এবার মূল বিষয়ে আসা যাক। ঐতিহাসিকদের একাংশ আর্যদের বহিরাগত মনে করেন। বিষয়টি নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক। ভারতের প্রাচীন নাম হচ্ছে জম্বুদ্বীপ। জম্বুদ্বীপের সীমানা অবিভক্ত ভারতবর্ষ থেকে অনেক বড়ো ছিল। উল্লেখ্য, কিছু পুরাণকথা বেদ থেকে বেশি প্রাচীন। যেমন, জম্বুদ্বীপের কথা ভালোভাবে পুরাণেই পাওয়া যায়। চক্ষুনদী, মেরুপর্বত ইত্যাদি নাম পুরাণে পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, আফগানিস্তান, কাজাকিস্তান ইত্যাদি নামের 'স্তান' শব্দের মূলে রয়েছে 'স্থান' যা মূলত সংস্কৃত থেকে এসেছে। আবার 'সমরকন্দ' নামের 'কন্দ' শব্দের মূলে 'খণ্ড' রয়েছে। বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, চক্ষুনদী-বিধৌত অঞ্চল ছিল বৃহত্তর জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত। আর্যদের বিচরণ ভূমি। আর্যরা জম্বুদ্বীপের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে এসেছে মাত্র। বহিরাগত হয় কীভাবে? তথাকথিত ঐতিহাসিকদের অনুরোধ করছি ভেবে দেখার। উল্লেখ্য, সম্রাট অশোক জম্বুদ্বীপেশ্বর নামে খ্যাত ছিলেন। জৈন ধর্মগ্রন্থে জম্বুদ্বীপের উল্লেখ আছে। ভারত তথা জম্বুদ্বীপের সভ্যতা হচ্ছে বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতা। মেরুকে কেন্দ্র করে মেরুর চারিদিকের ভূগোল পুরাণে পাওয়া যায়। বিশ্বের আর কোথাও এত প্রাচীন ভূগোল পাওয়া কঠিন। যাই হোক, পণ্ডিত সমাজ গবেষণা করে সঠিক বলতে পারবেন।

—রাজকুমার জাজোদিয়া,
কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

শোক সংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মালদা বিভাগ প্রচারক ধনেশ্বর মণ্ডলের পিতৃদেব কাঞ্চন মণ্ডল গত ১২ এপ্রিল পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি ২ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।